১.১ সেশন পরিকল্পনা

পরিবেশ, কৃষি পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় কৃষি পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় করণীয়

কৃষির সাথে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক হচ্ছে কৃষি পরিবেশ। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষির সহিত সম্পর্কিত পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন ফসল, মাটি, পানি, গাছপালা, পশু-পাখি, পোকা-মাকড়, রোগ, আলো, তাপমাত্রা এসব বিভিন্নভাবে প্রভাবিত এবং পরিবর্তিত হয়ে কৃষি পরিবেশকে বিরূপ করে তুলছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট কৃষির এ বিরূপ পরিবেশকে মোকাবেলা করে কৃষির অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে আমাদের অভিযোজনসহ বিভিন্ন কলাকৌশল নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

সেশনের উদ্দেশ্য

সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ জানতে পারবেন-

- পরিবেশ এবং কৃষি পরিবেশ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা;
- কৃষি পরিবেশ পরিবর্তনের কারণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনে কৃষি পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় করণীয়।

সময়: ৬০ মিনিট

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে পরিবেশ, কৃষি পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবেলায় তাদের গৃহীত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জেনে নিন;
- ফ্লিপ চার্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষি পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা।

উপকরণ: হোয়াইট বোর্ড মার্কার/ফ্লিপচার্ট

সহায়ক প্রশ্নাবলী

০১. ফসল উৎপাদনে পরিবেশে বিরূপ প্রভাব আছে কি?
০২. চাষ উপযোগী ফসল নির্বাচনে পরিবেশে সম্পর্ক আছে কি?

১.১ সেশন সহায়ক নোট

পরিবেশ, কৃষি পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় কৃষি পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় করণীয়

পরিবেশ: আমাদের চার পাশে যা কিছু আছে অর্থাৎ গাছ-পালা, মানুষ, পশু পাখি, মাটি, পানি, বাতাস, এসব নিয়ে পরিবেশ গঠিত হয়।

কৃষি পরিবেশ: কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত উপাদান যেমন- কৃষি জমি, ফসল, রোগ-বালাই, পোকা-মাকড়, পানি, বায়ু আলো, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত এসব নিয়ে কৃষি পরিবেশ গঠিত।

জলবায়ু পরিবর্তনে বন্যাপ্রবণ এলাকার কৃষি পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় করণীয়-

- চারা তৈরির জন্য উঁচু জায়গা বেছে নিতে হবে;
- বলান পদ্ধতিতে ধান আবাদ করতে হবে;
- উঁচু বা নিরাপদ জায়গায় বীজ সংরক্ষণ করতে হবে;

- বন্যার আগে তোলা যায় এমন ফসল যেমন আলু, ভূট্টা, চিনা বাদাম ও দ্রুত বর্ধনশীল শাক সবজি চাষ করতে হবে;
- বন্যার পানি নেমে যাবার সাথে সাথে বাড়ির আশপাশে রাস্তার ধারে চর এলাকায় পতিত জমিতে খেসারি, মাসকলাই, ভূট্টাসহ বিভিন্ন ফসল চাষ করতে হবে;
- সাইলেজ পদ্ধতিতে ঘাস সংরক্ষণ করতে হবে;
- বসতভিটা উঁচু করে তৈরি করে চারপাশে কলা গাছ এবং বাঁশসহ অন্যান্য গাছ লাগাতে হবে;
- হাঁস-মুরগির খামার উচুঁ জায়গায় স্থানান্তর করতে হবে;
- পুকুরের পাড় উঁচু করতে হবে এবং জাল দিয়ে পুকুরের চারদিক ঘিরে রাখতে হবে।
- বন্যাপ্রবণ এলাকার নদী ভাঙ্গন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যেমন নতুন বাঁধ দেয়া, কিংবা পুরাতন বাঁধ মেরামত করতে হবে;
- রাস্তাঘাট উঁচু করে তৈরি করতে হবে এবং তা ভাঙ্গন রোধে রাস্তার পাশে উপযোগী গাছপালা (রেইনট্রি, মেহেগনি ইত্যাদি) লাগাতে হবে;
- ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি ও মসলা চাষ করা;
- বন্যা সহনশীল ধান যেমন: ব্রি ধান৫১, ব্রি ধান৫২, বিনাধান-১১, বিনাধান-১২ ইত্যাদি চাষ করা।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর জমিতে যথাসম্ভব আইল বেঁধে পানি নিষ্কাশন করে আগাম জোঁ আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনে আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকার কৃষি পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় করণীয়

- বসতবাড়ির ভিটা উঁচু করতে হবে;
- আগাম জাত ও স্বল্প মেয়াদী (বিনাধান-৭, ব্রিধান২৮, ব্রিধান৩৩, ব্রিধান৩৯) ফসলের চাষ করতে হবে;
- বাঁধ রক্ষায় প্রয়াজনীয় ব্যবস্থা নিতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে;
- বিকল্প উপার্জনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- তাছাড়া উঁচু জায়গার অভাবে কলা গাছের ভেলা বা চাটাইয়ের উপর কাদামাটির প্রলেপ দিয়ে ভাসমান বীজতলা তৈরি করে এতে বীজ বপন করে পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুত রাখা;
- বন্যার সময় শুকনো জায়গার অভাব হলে টব, মাটির চাড়ি, কাঠের বাক্স, ড্রাম, ভাসমান কচুরিপানার স্তূপ বা কলার ভেলায় মাটি দিয়ে আগাম শীতকালীন সবজির চারা উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয়া;
- ভাসমান সবজি চাষ করা; ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি ও মসলা চাষ করা;
- কমিউনিটি বীজতলা তৈরি করা;
- আকস্মিক বন্যায় করণীয় সম্পর্কে কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনে খরাপ্রবণ এলাকার কৃষি পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় করণীয়

- খরা অঞ্চলে আগাম জাতের রোপা আমন (ব্রিধান ৩৩, ব্রিধান-৩৯ বা উপযোগী অন্যান্য জাত) চাষ করে আগাম কেটে ছোলা বা খরা সহিষ্ণু ফসল নির্বাচন করা যায়। তাছাড়া খরা সহনশীল আউশ ব্রিধান ৪২, ব্রিধান ৪৩ চাষ করা যায়;
- মিনি পুকুর খনন করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে সম্পূরক সেচ দেয়া যায়;
- শুকনা বীজতলা/কমিউনিটি বীজতলা তৈরি করা;
- এডব্লিউডি পদ্ধতির ব্যবহার;
- গাছের গোড়ায় মালচিং ও জাবড়া প্রয়োগ করা;
- জৈব সার তৈরি ও ব্যবহারকরে মাটির উর্বরতা এবং পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- আবহাওয়ার প্রতি নজর রেখে কৃষি কাজের পরিকল্পনা করা;
- বাড়ির আশপাশে বেশি করে গাছ লাগানো;
- বারি গম-২৫ ও বারি গম-২৬ জাত চাষ করা;
- পারিবারিক ও যৌথ উদ্যোগে পুকুর গভীরভাবে খনন করা।

জলবায়ু পরিবর্তনে লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকার কৃষি পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় করণীয়

- লবণ সহিষ্ণু বোরো মৌসুমে ব্রি ধান৪৭, ব্রি ধান৬১, আমন মৌসুমে ব্রি ধান৪০, ব্রি ধান৫৩, ব্রি ধান৫৪, বিনাধান-৭ এবং বোরো ও আউশ মৌসুমে ব্রি ধান৫৫ প্রভৃতি ও আগাম জাত ব্যবহার করা;
- মালচিং-এর ব্যবহার;
- আমন ধানের সাথে রিলে ফসল হিসেবে খেসারি, মটর ও ফেলন ডাল চাষ;
- সর্জান পদ্ধতিতে সবজি ও ফলের চাষ;
- ঘেরের আইলে/পুকুর পাড়ে সবজি চাষ;

- বারি গম-২৫ জাত চাষ করা;
- লোনা পানি সহনশীল মাছ (যেমন- বাটা, পাইশ্যা, খরগুলা, ভেটকি), চিংড়ি, কাঁকড়া চাষ করা;
- শুকনো মৌসুমে ট্রাক্টর দ্বারা গভীরভাবে জমি চাষ দিতে হবে।

১.২ সেশন পরিকল্পনা

আবহাওয়া, জলবায়ু ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ। আপদ, দুর্যোগ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি বলতে কি বুঝায়? দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পর্যায় ও কার্যক্রম

আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কিছু সাধারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশ্বব্যাপী প্রায়শই ঘটছে। শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে এর মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভুক্তভোগী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশকে সবচেয়ে বিপন্ন দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষণীয়। তাই আমাদের এ ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন

সেশনের উদ্দেশ্য:

সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ জানতে পারবেন-

০১. আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা;
০২. আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য;
০৩. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ;
০৪. আপদ, দুর্যোগ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি ইত্যাদি;
০৫. দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা।

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ফ্লিপ চার্ট

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে আবহাওয়া, জলবায়ু, আপদ, দুর্যোগ, ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে নিবেন;
- ফ্লিপ চার্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোচনা করা;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা।

সেশন সহায়ক প্রশ্নাবলী

০১. জলবায়ু পরিবর্তন কি শুধু মানুষের কাজের জন্য হচ্ছে?
০২. দুর্যোগ কি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কারণে ঘটে?
০৩. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কি সারা বিশ্বে পড়ছে?

১.২ সেশন সহায়ক নোট

আবহাওয়া, জলবায়ু ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ। আপদ, দুর্যোগ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি বলতে কি বুঝায়? দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পর্যায় ও কার্যক্রম

আবহাওয়া ও জলবায়ু এক অন্যের সাথে পরস্পর সম্পর্কিত একটি বিষয়। বিশেষত ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর প্রভাব লক্ষণীয়। বর্তমান বিশ্বে আবহাওয়া ও জলবায়ু দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। তাই আমাদের এ ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক।

আবহাওয়া: কোনো নির্দিষ্ট স্থানের নির্দিষ্ট দিন বা সময়ের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বায়ুর চাপ, বায়ু প্রবাহ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত এবং তাদের মিথস্ক্রিয়ার সামগ্রিক ফলাফলকে আবহাওয়া বলে। সাধারণত আবহাওয়ার হিসাব প্রতিদিন নেয়া হয়। এমনকি প্রতি ঘন্টায়ও আবহাওয়ার হিসাব নেয়া হয়। কারণ আবহাওয়া প্রতিদিন এমনকি প্রতি মিনিটে পরিবর্তন হতে পারে। আবহাওয়ার উপাদানগুলো হলো-

- তাপমাত্রা
- আর্দ্রতা
- সূর্যের কিরণ
- বাতাস
- বৃষ্টিপাত
- বাষ্পীভবন

জলবায়ু: জলবায়ু হলো আবহাওয়ার গড় ফলাফল। আইপিসিসি-এর মতে- কোনো নির্দিষ্ট স্থানের এবং নির্দিষ্ট সময়ের (কমপক্ষে ৩০ বছর) আবহাওয়ার উপাদানগুলোর (যেমন- তাপমাত্রা, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির) পরিসংখ্যানিক গড় ফলাফলই হলো জলবায়ু।

গ্রিনহাউস গ্যাস

বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত যেসব গ্যাস তাপ শোষণ করে পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়িয়ে তোলে তাদেরকে গ্রিনহাউস গ্যাস বলা হয়। কিছু গ্রিনহাউস গ্যাস প্রকৃতিগতভাবেই বায়ুমণ্ডলে রয়েছে। এগুলি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট। যেমন– জলীয় বাষ্প, ওজোন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি। আর মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির উৎপত্তি হয়। ১৯৯৭ সালের কিয়োটো চুক্তি (Kyoto Protocol) অনুযায়ী (১) কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), (২) মিথেন (CH_4), (৩) নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), (৪) হেলো কার্বন (HC), ওজোন (O_3) এবং সালফার অক্সাইড (SO_2) এই ৬টি গ্যাসকে প্রধান গ্রিনহাউস গ্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেসব গ্রিনহাউস গ্যাস বায়ুমণ্ডলের গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে তাদের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ও হেলো কার্বন প্রধান।

গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এমন কিছু গ্যাসের উপস্থিতি রয়েছে যারা সূর্যরশ্মি শোষণের মাধ্যমে পৃথিবীর উত্তাপ বাড়িয়ে তোলে। এই গ্যাসগুলি গ্রিনহাউস গ্যাস নামে পরিচিত। শীতপ্রধান দেশগুলিতে সবজি চাষের জন্য কাচের ঘর তৈরি করে যেভাবে বাইরে থেকে আসা তাপকে আটকে রাখা হয়, ঠিক সেভাবেই বায়ুমণ্ডলের গ্রিনহাউস গ্যাসগুলি সূর্যের তাপকে আটকে রাখে। মেঘ এবং বায়ুমণ্ডলের গ্রিনহাউস গ্যাসগুলি ও ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত অবলোহিত রশ্মি (দীর্ঘ তাপতরঙ্গ-infrared) খুব সহজেই শোষণ করে নেয়। এর ফলে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং বায়ুমণ্ডল থেকে তাপ চারিদিকে (এমন কি ভূপৃষ্ঠের গভীরেও) ছড়িয়ে পড়ে। একে গ্রিনহাউস পতিক্রিয়া বলে। এই গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলেই পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ছে। তবে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসেরও প্রয়োজন আছে। বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস একেবারে না থাকলে বর্তমানে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১৫০ সেলসিয়াসের পরিবর্তে মাইনাস (–) ১৮০ সেলসিয়াস হত। ফলে অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় পৃথিবীর জীবকুলের বেঁচে থাকা সম্ভব হত না। কিন্তু গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি আবার বিশ্বের উষ্ণতা বাড়িয়ে তুলছে। তাই গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির পরিমাণ বৃদ্ধিকে নিরাপদ মাত্রার মধ্যে সীমিত রাখার মাধ্যমেই বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রবণতাকে রোখা যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন কি?

- পৃথিবী সৃষ্টির মুহূর্ত হতেই জলবায়ুর নিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে এবং এ পরিবর্তন চলতেই থাকবে। আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখে অভ্যস্ত।
- আবহাওয়ার এ পরিবর্তনের ফলে (বৃষ্টিপাত, সূর্যকিরণ, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বাতাস ও বাষ্পীভবন প্রভৃতির পরিবর্তন) প্রকৃতি বৈচিত্র্য পেয়েছে।
- প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও মানুষের সৃষ্ট কর্মকাণ্ডের ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের দীর্ঘ সময়ব্যাপী যে পরিবর্তন হয় সেটাই হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন।
- সাম্প্রতিক সময়ে (গত কয়েক শতকে) বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বাড়ার ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের হার নজিরবিহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে আর এ তাপমাত্রা বাড়ার কারণ হলো গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রতিক্রিয়া।

- সাধারণ অবস্থায় সূর্য থেকে যে তাপ শক্তি আসে, তার কিছু অংশ ভূ-পৃষ্ঠকে (সমুদ্রপৃষ্ঠসহ) উত্তপ্ত করে আর বেশির ভাগই প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় মহাকাশে চলে যায়। কিন্তু এ তাপরশ্মি মহাকাশে ফেরৎ যাওয়ার পথে বায়ুমণ্ডলের কিছু গ্যাস (CO_2, CH_4, N_2O, CFC ইত্যাদি, যা গ্রিনহাউস গ্যাস নামে পরিচিত) এ তাপ ধরে রাখে। ফলে পৃথিবী ক্রমাগত উত্তপ্ত হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ

পৃথিবী নামক এই গ্রহের জলবায়ু প্রাকৃতিক চক্রের মধ্য দিয়ে সর্বদাই গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর অতীত এবং বর্তমানকালের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ এবং এর অনুসন্ধানসহ প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের উপাত্তের ব্যবহার, যেমন- হিমবাহের বরফের আস্তরণের পুরুত্ব, গভীরতা; বরফের বুদবুদ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, সমুদ্রের পললের আস্তরণ, উদ্ভিদের পরাগরেণু বিশ্লেষণ, প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবাশ্ম, বৃক্ষের বার্ষিক ক্রমবৃদ্ধির বলয় (Tree ring) ইত্যাদি ব্যবহার করে এর কারণ নির্ণয় করার চেষ্টা করে চলেছেন। অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে এ পৃথিবীর জলবায়ু ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে, হচ্ছে এবং আগামীতেও হবে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. প্রাকৃতিক কারণ

২. মনুষ্য সৃষ্ট কারণ

জলবায়ু পরিবর্তনে প্রাকৃতিক কারণ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলো অন্যতম।

- সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন;
  - পৃথিবীর অক্ষকোণের পরিবর্তন (Change of earth axial tilt);
  - পৃথিবীর কক্ষপথের পরিবর্তন (Change of earth orbit);
  - সূর্যের অনসুর অবস্থানের অয়নচলন (Procession of the perihelion);
- সূর্যের শক্তি উৎপাদনের হ্রাস বৃদ্ধি (Variation in solar output);
- মহাদেশসমূহের স্থান পরিবর্তন (Continental drift);
- সমুদ্র স্রোত ও মহাসাগরসমূহের সঞ্চিত উত্তাপ শক্তির পরিবর্তন (Changes in leat stored in ocean);
- আগ্নেয়গিরির দূষণ (Volcanic pollution);
- এল নিনো (El Niño and) এবং লা নিনা (La Niña)-এর প্রভাব।

জলবায়ু পরিবর্তনে মনুষ্য সৃষ্ট কারণ

জলবায়ু পরিবর্তনে মনুষ্য সৃষ্ট কারণের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলো প্রধান।

- ১৯ শতকের সূচনালগ্ন এবং শিল্প বিপ্লবের পর থেকে, বিদ্যুৎ উৎপাদন, কল-কারখানা, যানবাহন, দৈনন্দিন কাজে ব্যাপক হারে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের হার বেড়ে যাওয়ার ফলে এর ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে পৃথিবী ক্রমাগত উষ্ণতর হচ্ছে।
- নির্বিচারে বন উজাড় করা, ভূমি ও জলাভূমি পরিবর্তন এবং কৃষি কাজে অনিয়ন্ত্রিত সার ব্যবহার, জৈবিক পচনের ফলে মিথেনের নির্গমন, শহরাঞ্চলে বর্জ্য এবং আবর্জনা থেকে নির্গত অনিয়ন্ত্রিত মিথেন গ্যাস, কৃষি কাজের ফলে উৎপন্ন নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি মনুষ্য সৃষ্ট কারণের মধ্যে অন্যতম।
- রেফ্রিজারেটর, ডিপফ্রিজ, ফ্রিজ, বিভিন্ন ধরনের শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত সিএফসি, হ্যালোন, ফ্রেয়ন ইত্যাদি গ্যাসের ব্যবহার।
- এ ছাড়া বায়ু দূষণজনিত কারণে মিথেন, জলীয়বাষ্প এবং ওজোন প্রভৃতি গ্যাসের ঘনত্ব বায়ুমণ্ডলে বৃদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে ফলশ্রুতিতে পৃথিবী ক্রমাগত উষ্ণতর হচ্ছে।
- বিভিন্ন খনিতে বিশেষ করে, কয়লা খনি থেকে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস, প্রাকৃতিক গ্যাস খনি থেকে নির্গত (Gas flaring and leakage) মিথেন গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়া ইত্যাদি।

গ্রিনহাউস গ্যাসের উৎস

এনার্জি ক্ষেত্র-

- শক্তি উৎপন্ন হয় এমন শিল্প;
- ম্যানুফাকচার ও কনস্ট্রাকশন শিল্প;
- পরিবহন খাত;
- আবাসিক খাত;
- বাণিজ্যিক খাত।

কৃষি ক্ষেত্রে-

- ফারমেন্টেশন;
- সার ব্যবস্থাপন;
- ধান উৎপাদন;
- কৃষি জমি;
- কৃষি জমির আবর্জনা পোড়ানো।

শিল্প উৎপাদন খাত

- খনিজ দ্রব্য;
- রাসায়নিক শিল্প;
- ধাতব দব্য উৎপাদন;
- হ্যালোকার্বন ও সালফার হেক্সাফ্লুরাইড উৎপাদন;
- হ্যালোকার্বন ও সালফার হেক্সাফ্লুরাইড পোড়ানো।

আবর্জনা খাত

- সলিড আবর্জনা ভূমিতে স্তূপকরণ;
- ব্যবহৃত পানির ব্যবহার;
- আবর্জনা পেড়ানো;
- জমির ব্যবহারে পরিবর্তন;
- জমির রূপান্তর;
- কাঠ পোড়ানো ও বন ধ্বংস।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফল

- সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি;
- বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি;
- জীব বৈচিত্র্যে পরিবর্তন;
- খরার প্রকোপ বৃদ্ধি।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

- গড় বার্ষিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি;
- লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও জমির উর্বরতা হ্রাস;
- গড় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি;
- আকস্মিক বন্যায় বোরো ধান নষ্ট করছে;
- লোনা পানি স্বাদু পানির সাথে মিশে যাচ্ছে;
- বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে খরা বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- অনিয়মিত বৃষ্টি হচ্ছে;
- অবকাঠামো ধ্বংস হচ্ছে;
- বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম-বেশি হচ্ছে;
- তাপমাত্রার বৈষম্য এবং শীতের সময়কাল পরিবর্তিত হচ্ছে।
- প্রয়োজনীয় সময়ে বৃষ্টিপাত না হওয়া;

- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা বৃদ্ধি;
- বিভিন্ন মৌসুমগুলো সময়মতো আসা বা না আসা।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যা ঘটতে পারে

- তাপ প্রবাহ বৃদ্ধি;
- প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাত্রা ও তীব্রতা বৃদ্ধি;
- জমাট বরফ (গ্লেসিয়ার) গলে যাওয়া;
- সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়া;
- উপকূলীয় অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার প্রাদুর্ভাব;
- ঋতু বৈচিত্র্যে পরিবর্তন;
- রোগবালাইয়ের বিস্তার;
- উদ্ভিদ ও প্রাণি বৈচিত্র্যের পরিবর্তন।

বিপদ (Hazard): বিপদ হচ্ছে এমন একটি চরম ঘটনা বা জানমালের হানি ঘটাতে এবং পরিবেশের ক্ষতিসাধন করতে পারে। বিপদ/আপদ একটি অস্বাভাবিক ঘটনা যা প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট বা কারিগরি ত্রুটির কারণে ঘটতে পারে এবং যা দ্বারা মানুষের জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন- বন্যা, খরা ইত্যাদি।

আপদ দুর্যোগ নয়, দুর্যোগের সম্ভাব্য কারণ। যেমন- ভূমিকম্প একটি আপদ। এদ্বারা ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হলে দুর্যোগ দেখা দিতে পারে।

দুর্যোগ: আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত নানা রকম ঘটনা ঘটছে যা স্বাভাবিক জীবন ধারাকে গতিশীল রাখে। জীবনযাত্রাকে সেভাবে ব্যহত করে না। প্রকৃতি অথবা মানবসৃষ্ট আপদ দ্বারা সংঘটিত এমন এক চরম পরিস্থিতি যাতে মানুষ ও তার জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়, যখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হয় তখন তাকে দুর্যোগ বলে।

আপদ এবং বিপদাপন্নতা এ দুটো একত্রে হলে তখন তাকে দুর্যোগ বা দুর্যোগ পরিস্থিতি বলা হয়।

দুর্যোগ = আপদ X বিপদাপন্নতা

যেমন- ঘূর্ণিঝড় সিডর হলো আপদ। এর কারণে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ যখনই হলো তখন ইহা দুর্যোগ।

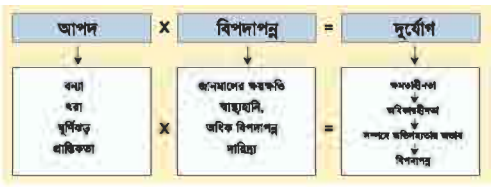

বিপদাপন্ন: যখন কোনো এলাকার জনগোষ্ঠী দুর্যোগ অথবা অন্য কোনো ধরনের ঝুঁকি দ্বারা আক্রান্ত হয় অথবা সৃষ্ট ফলাফল মোকাবেলায় অসমর্থ হয় তখন সে অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে বিপদাপন্ন বলে।

বিপদাপন্নতা: কোনো জনগোষ্ঠীর বা তার অংশের ব্যক্তি বা পরিবারের কোনো এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট আপদে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা এবং ঐ আপদ সংঘটনের ফলে সমাজ ও ব্যক্তি জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাই হলো বিপদাপন্নতা।

বিপদাপন্নতার সাথে সম্পর্কিত (Vulnerability):

- জনগোষ্ঠীর অবস্থান
- জনগোষ্ঠীর দল (পুরুষ/ মহিলা)
- জনসংখ্যার ঘনত্ব
- অর্থনৈতিক, বস্তুগত সম্পদের অবস্থা, মূল্য, অধিকার প্রভৃতি
- গুরুত্বপূর্ণ সুযোগসুবিধাগুলোর অবস্থান, মান, ক্ষমতা।

ঝুঁকি (Risk): ঝুঁকি হচ্ছে জীবন, সম্পদ এবং পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি হবার একটি সম্ভাবনা। ঝুঁকি বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবার ব্যাপ্তি হচ্ছে বহুসংখ্যক ঘটনা সংঘটনের ধারাবাহিক সংযোগসমূহের প্রতিক্রিয়ার ফলাফল।

আপদ বা আপদসমূহ বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী এবং পরিবেশ এই তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাবের আশংকাই হলো ঝুঁকি।

ঝুঁকি = আপদ আশংকা + বিপদাপন্নতা। যেমন- ঝড়ে ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও অনেকে তাদের সঞ্চয়, উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে সমাজ, পরিবার বা অন্য কারো সহযোগিতায় ঘরবাড়ি তৈরি করতে পারে। তাই স্থান, কাল ও সামর্থ্যভেদে ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন।

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান যার মাধ্যমে দুর্যোগের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি, প্রতিরোধ, হ্রাসকরণ, জরুরী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। এর উদ্দেশ্য হলো:

- সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- মানুষ ও পশুপাখির দুর্ভোগ হ্রাস করা;
- জনসাধারণ ও যথাযথ কর্তৃপক্ষকে দুর্যোগ ঝুঁকিসমূহের ব্যাপারে সময়মতো অবহিত করা;
- সম্পদের ক্ষতি ও অর্থনৈতিক লোকসান কমানো;
- উন্নয়নের লক্ষ্যে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রম জোরদার করা;
- দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি কার্যক্রম হাতে নেয়ার জন্য জনগণ ও কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করা।

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পর্যায় ও কার্যক্রম

দুর্যোগের পূর্বে (স্বাভাবিক পর্যায়)	দুর্যোগকালীন (জরুরী পর্যায়)	দুর্যোগের পরে (পুনরুদ্ধার পর্যায়)
• জনগণকে দুর্যোগের পূর্বাভাস দেয়া ও সতর্ক করা • দুর্যোগ প্রতিরোধ ও হ্রাসকরণ, দুর্যোগজনিত বিপদ কমানো ও সম্মিলিতভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য পরিকল্পনা আগে থেকেই করে রাখা।	• দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য ও সংকেত নিয়মিত প্রদান করা • উদ্ধার করা ও হতাহতের যত্ন নেয়া • ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা • জরুরী সেবা কার্যক্রম হাতে নেয়া • বিশুদ্ধ খাবার পানি নিশ্চত করা • যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখা	• জনগণের সক্ষমতা বাড়ানো • পুনর্গঠন কার্যক্রম হাতে নেয়া • কৃষি ও কর্মসংস্থানের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেয়া • উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া • যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত সংস্কার করা

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতি

- জরুরী ত্রাণ কার্যক্রমের চেয়ে দুর্যোগের মূল কারণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেয়া। দুর্যোগের কারণ বের করে সে অনুযায়ী বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া। আর ত্রাণ নয়, উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করা।
- দুর্যোগ পরবর্তী সাহায্যের চেয়ে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতির ওপর বেশি জোর দেয়া।

- দুর্যোগের জন্য আগে থেকেই তৈরি থাকা।
- দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য অন্যের ওপর নির্ভর না করে নিজের সক্ষমতার ওপর নির্ভর করা।
- বাইরের ছোট ছোট সাহায্যের চেয়ে অভ্যন্তরীণ পূর্ণাঙ্গ সাহায্যের ওপর জোর দেয়া।
- ব্যক্তিগত সাহায্যের চেয়ে সম্মিলিত জনগোষ্ঠীর সহযোগিতার ওপর নির্ভর করা।
- অস্থায়ী ব্যবস্থা থেকে পেশাভিত্তিক স্থায়ী ব্যবস্থার ওপর জোর দেয়া।

তৃণমূল পর্যায়ে কৃষিক্ষেত্রে সমাজভিত্তিক দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতির পরিকল্পনা

পূর্বপ্রস্তুতি পরিকল্পনা কি?

অতীতের দুর্যোগের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতে অনুরূপ একটি ঘটনাকে অনুমান করে পূর্ব থেকে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য যথাযথ এবং কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাহলো দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি পরিকল্পনা।

এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো:

- দুর্যোগজনিত মৃত্যু রোধ করা;
- সম্পদের ক্ষতি ও ঝুঁকি কমানো;
- জীবনযাত্রার ক্ষতি কমানো।

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার ধরন

দুটি অবস্থার ওপর পূর্বপ্রস্তুতি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যথা:

ক) দুর্যোগের ক্ষতি কমানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং

খ) জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা

ক) দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রধান ধাপসমূহ

গ্রামের বিভিন্ন দুর্গত জনসাধারণ, পেশাজীবি দল, মহিলা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও অন্যান্য সবার সঙ্গে দলীয়, একক, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনার প্রতিটি ধাপে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা করতে হবে। অংশগ্রহণকারীগণ তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন। প্রধান ধাপসমূহ নিম্নে দেয়া হলো:

ধাপ-১: বিগত দুর্যোগের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ

বিগত দুর্যোগের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের জন্য নিম্নের বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে-

- গত দুর্যোগ মোকাবেলার অভিজ্ঞতা বর্ণনা ও লিপিবদ্ধ করা;
- দুর্যোগের পূর্বে, দুর্যোগের সময় ও দুর্যোগের পরে কি কি ঘটেছিল?
- পূর্বসতর্কীকরণের প্রভাব কি রকম ছিল?
- দুর্যোগের তীব্রতা কেমন ছিল?
- ক্ষতির পরিমাণ কেমন ছিল (বিভিন্ন ক্ষেত্রে)?
- নিজস্ব উদ্যোগে দুর্যোগ মোকাবেলার ধরন কি রকম ছিল?
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় কোন্ বিষয়ের ঘাটতি ছিল কি না?
- স্থানীয়ভাবে ও বাইরে থেকে কি কি সম্পদ পাওয়া গিয়েছিল?
- কোন্ ধরনের লোক থেকে অধিক সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছিল?

ধাপ-২: দুর্যোগ/বিপদাপন্নতা/অবস্থার বিশ্লেষণ

অবস্থা বিশ্লেষণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে-

- কোন্ এলাকায় কোন্ ধরনের দুর্যোগের সম্ভাবনা আছে?
- কখন এবং কত ঘন ঘন দুর্যোগ ঘটে এবং কারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

- এসব দুর্যোগ কত সময় স্থায়ী হয়?
- এসব দুর্যোগ কি রকম প্রকট হয় এবং
- এসবের দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ কি রকম হতে পারে?

ধাপ-৩: দুর্যোগ ও ঝুঁকির ম্যাপিং

অতিত অভিজ্ঞতার আলোকে দুর্যোগ ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার ম্যাপিং করতে হবে। নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে-

- প্রথমে এলাকা নির্বাচন করতে হবে;
- এলাকায় বসবাসকারীদের তালিকা, পরিবারের সংখ্যা, তাদের আর্থিক অবস্থা, পেশার ধরন বের করতে হবে;
- বিভিন্ন রকম দুর্যোগ যেমন, ভয়াবহ নদী বাহিত ও আকস্মিক বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড়, ঝুঁকিপূর্ণ স্থান ও জনগোষ্ঠী, অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সেবার অবস্থা, সড়কপথ ও অন্যান্য যাতায়াতের অবস্থা প্রভৃতি ম্যাপে উল্লেখ করতে হবে;
- বন্যার ফলে কখন, কোথায়, কতটুকু পানির উচ্চতা হয় এবং কোন্ কোন্ রাস্তা ভেঙ্গে যায় সেটাও ম্যাপে উল্লেখ থাকতে হবে;
- কত সংখ্যক লোক স্থানান্তরিত করতে হয় তা বের করতে হবে। তাদের আশ্রয়, খাদ্য, কাপড়-চোপড়, চিকিৎসার জন্য কি কি দরকার তার নিরীখে কি কি প্রয়োজন সেগুলোর পরিমাপ করতে হবে;
- এভাবে কমিউনিটির বিভিন্ন দলের সঙ্গে দুর্যোগ ও ঝুঁকির ম্যাপিং করতে হবে।

ধাপ-৪: সমস্যা চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার নিরূপণ ও বিশ্লেষণ

সমস্যা নিরূপণ একটা জটিল বিষয়। সমস্যা চিহ্নিত ও সমস্যার কারণ সঠিকভাবে বের করতে পারলে পরিকল্পনা প্রণয়নও সহজ হবে। সমস্যা নিরূপণের জন্য কৃষক, জেলে, ব্যবসায়ী, মহিলা, পেশাজীবি সব ধরনের দলের সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় আলাদাভাবে বসতে হবে। তাদেরকে দুর্যোগ সংক্রান্ত সমস্যা বের করার জন্য বলতে হবে। একই সঙ্গে সমস্যার কারণগুলোও বের করার জন্য বলতে হবে। এ ব্যাপারে নিম্নের ছক ব্যবহার করা যেতে পারে-

ক্রমিক নং	সমস্যা	সমস্যার কারণ

এরপর বিভিন্ন দলের সমস্যা একত্র করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাজাতে হবে।

ধাপ-৫: সমাধান চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার নিরূপণ ও বিশ্লেষণ

অগ্রাধিকারভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করতে হবে। সমাধান করার ফলে কারা লাভবান ও কারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সেটাও বের করতে হবে। এ জন্য নিম্নের ছক ব্যবহার করতে হবে।

ক্রমিক নং	সমস্যা	সমাধান	প্রভাব	ক্ষতিগ্রস্ত দল

ধাপ-৬: পরিকল্পনা প্রণয়ন

সমস্যার বিশ্লেষণ সঠিকভাবে করার পর ও সমাধানের অগ্রাধিকারের ব্যাপারে একমত হওয়ার পর পরিকল্পনা করতে হবে। পরিকল্পনার ছক নিচে দেয়া হলো-

পরিকল্পনার ছকঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন কাল	বাস্তবায়ন পদ্ধতি	বাস্তবায়নের দায়িত্ব			বাজেট		
				কমিউনিটি	ডিএফই	অন্যান্য স্টেকহোল্ডার	কমিউনিটি	ডিএফই	অন্যান্য স্টেকহোল্ডার

ধাপ-৭: পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও বিভিন্ন সেবা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য গ্রাম কমিটি ও ইস্যুভিত্তিক কমিটিগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত। সঠিক সময় সঠিক কার্যক্রম অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্যে বিভিন্ন সহায়তাকারী সংস্থা, স্টেকহোল্ডার, দাতা সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। কোনো কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে না পারলে তার কারণ বের করতে হবে।

খ) জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার ধাপসমূহ

ধাপ-১: পূর্বসতর্কীকরণ

দুর্যোগ পূর্বসতর্কীকরণ গ্রহণের জন্য অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সম্ভাব্য দুর্যোগের বিষয় বা দিক বিবেচনায় রাখতে হবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে জনগণকে আগেই সতর্ক করে দিতে হবে:

- কোন্ সময় দুর্যোগ আঘাত হানতে পারে;
- দুর্যোগ কোন্ কোন্ স্থানে আঘাত হানতে পারে;
- কি ধরনের দুর্যোগ কি ধরনের আঘাত হানতে পারে;
- কি ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে;
- ফলাফল কি হতে পারে;
- কারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ধাপ-২: উদ্ধারকার্য

কিভাবে, কোন্ ব্যবস্থাপনায় কাদের এবং কোথায় স্থানান্তর করতে হবে এসবই উদ্ধার কাজের মূল অংশ।

- উদ্ধার কার্য পরিচালনার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করতে হবে;
- উদ্ধারের জন্য যানবাহন যেমন- নৌকা, ভেলা, সাইকেল, রিক্সা, গরুর গাড়ি ও লোকবলের ব্যবস্থা আগেই করে রাখতে হবে যাতে জরুরীর সময় এগুলো ব্যবহার করা যায়;
- মহিলা ও শিশুদের আগে উদ্ধার করতে হবে;
- গবাদি পশু, হাঁস-মুরগিও উদ্ধার কার্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ধাপ-৩: আশ্রয়কেন্দ্র

বন্যা আসার পর জরুরী ভিত্তিতে জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর করতে হবে। এজন্য পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। যেমন- পূর্বের বন্যার সময় কোন্ এলাকার কোন্ পরিবারকে আগে আশয়কেন্দ্রে যেতে হয়েছিল, গ্রামের কোন্ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে হয়েছিল, কি কি অসুবিধা হয়েছিল এবং সে সবের সমাধান কিভাবে করা হয়েছিল? এসব বিষয় আগে থেকেই বিশ্লেষণ করলে আশয়কেন্দ্রের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি নেয়া সহজ হবে। নিম্নের বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে-

- স্থানীয় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবনগুলোকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বন্যার আগেই সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে;
- এলাকার উঁচু জায়গা যেমন- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ ও মহাসড়কে আশ্রয় নেয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে অস্থায়ী সেড নির্মাণ করতে হয়;
- আশ্রয়কেন্দ্রের আশ্রয়গ্রহণকারীদের রেজিস্ট্রেশন ও মনিটরিং করতে হবে;
- আশ্রয়কেন্দ্রের নিরাপত্তা বিষয়টি অবশ্যই দেখতে হবে। এজন্যে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা যেতে পারে;
- খাবার পানির সংকট দেখা দিতে পারে। পানি শোধন বড়ি ও ফিট্‌কিরির ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সবাই বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারে;
- আশ্রয়কেন্দ্রে পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে জোর দিতে হবে;
- আশ্রয়কেন্দ্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য ফার্স্ট এইড বক্স এবং ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক দলের ব্যবস্থা করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রে মহিলা ও শিশুদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে

ধাপ-৪: ত্রাণ বিতরণ

ত্রাণ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর জোর দিতে হবে:

- কি পরিমাণ ত্রাণ লাগবে এবং কি পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী মজুদ আছে তার হিসাব করতে হবে;
- বাড়তি ত্রাণসামগ্রী কিভাবে, কোথায় থেকে পাওয়া যাবে তার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। এজন্যে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ, এনজিও, দাতা সংস্থা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের কাছে আবেদন করা যেতে পারে;
- স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে তাদের মাধ্যমে ত্রাণ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে;
- ত্রাণ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি ঠিক করে নিতে হবে;
- ত্রাণসামগ্রীর হিসাব সঠিকভাবে রাখতে হবে।

ধাপ-৫: ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ

ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- উপদ্রুত জনগোষ্ঠীর চাহিদা নিরূপণ;
- কার্যক্রমের অগ্রাধিকার ঠিক করা;
- পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক জরিপ কাজ পরিচালনা করা যেতে পারে।

ধাপ-৬: পুনর্বাসন কর্মসূচি

দুর্যোগ দুর্গত জনগণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম হিসেবে কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। এজন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, অন্যান্য অধিদপ্তর ও এনজিওর সহায়তায় দুর্গত এলাকার জনগণকে সাহায্য করা যেতে পারে। তাছাড়া, আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থাও

১.৩ সেশন পরিকল্পনা

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের কৃষিতে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ

ক্রমবর্ধমান উষ্ণতার কারণে আমাদের জলবায়ুর কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে। জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ যেমন- বন্যা, খরা, আকস্মিক বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও লবণাক্ততার প্রকোপ দিন দিন বাড়ছে, যার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে আমাদের কৃষিতে। কৃষি ক্ষেত্রে জলবায়ুর প্রভাবে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ সমাধান কিংবা মোকাবেলায় আমাদের যথাযথ প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন।

সেশনের উদ্দেশ্য

সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা জানতে পারবেন-

- জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের কৃষি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা জানতে পারবে;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষির উপর কি প্রভাব পড়ছে তা বলতে পারবেন।

সময়: ৬০ মিনিট

উপকরণ: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার/ ফ্লিপ চার্ট।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এ সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করবেন;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনা মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের কৃষিতে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ সম্পর্কে জেনে নিবেন;
- ফ্লিপ চার্টের মাধ্যমে আলোচনা করা;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেওয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা।

সেশন সহায়ক প্রশ্নাবলী

০১. জলবায়ু পরিবর্তনে কি কি সমস্যা হয়?

০২. বন্যায় ক্ষতিসমূহ কি কি?

১.৩ সেশন সহায়ক নোট

জলবায়ু পরিবর্তনে কৃষি ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ

সৃষ্টির শুরু থেকেই প্রতিনিয়ত জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে তা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। ভৌগোলিক অবস্থার কারণে বাংলাদেশ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে জলবায়ুর এ পরিবর্তনের ফলে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে কৃষি সেক্টরে। তাই কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের এ প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য অভিযোজনসহ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে আমদের এগিয়ে যেতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব

- অতিবৃষ্টি;
- কম বৃষ্টিপাত;
- তাপমাত্রা বৃদ্ধি;
- মেরু অঞ্চল ও পর্বতের জমাট বরফ গলে যাওয়া;
- সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি।

কৃষি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব

০১. অতিবৃষ্টিজনিত কারণে ঘন ঘন এবং ভয়াবহ বন্যা হয় যার ফলে কৃষি জমি প্লাবিত হয়, ক্ষয় হয় এবং ফসল ও মৎস সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়;

০২. কম বৃষ্টিপাতের ফলে খরা অবস্থা দেখা দেয় এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে চলে যায়, যার ফলে কৃষি ক্ষেত্রে সেচের পানির অভাব হয় এবং মাটির পুষ্টির ঘাটতি হয়;

০৩. তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পোকা-মাকড়ের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়। ফসল ও গবাদি পশুর রোগ বৃদ্ধি পায়;

০৪. বরফ গলে যাওয়ার কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। ফলে কৃষি জমি প্লাবিত হয় এবং লোনা পানির অনুপ্রবেশ ঘটার ফলে মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়।

১.৪ সেশন পরিকল্পনা

শস্যপর্যায়

জমির উর্বরতা রক্ষা এবং ক্ষতিকারক রোগবালাই ও পোকা-মাকড়ের হাত থেকে ফসল রক্ষা করে সর্বাধিক কৃষি উৎপাদনের লক্ষে শস্যপর্যায় অবলম্বন কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতাসহ কৃষি পরিবেশের পরিবর্তনের কারণে দেশের সব অঞ্চলে সব ফসল চাষ করা যাচ্ছে না। আবার একই জমিতে একই ধরনের ফসল বছরের পর বছর আবাদ করেও লাভবান হওয়ার সুযোগ কম। তাই শস্যপর্যায় বা শস্যচক্র অবলম্বন করে কৃষি ক্ষেত্রে আমরা অনেক বেশি সুফল পেতে পারি।

সেশনের উদ্দেশ্য

সেশন শেষে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবেন-

- শস্যপর্যায়;
- শস্যপর্যায় অবলম্বনের সুবিধাসমূহ;
- শস্যপর্যায় অবলম্বনে বিভিন্ন নীতিমালা।

সময়: ৬০ মিনিট

উপকরণ: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার/ফ্লিপ চার্ট।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এ সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে শস্যপর্যায় সম্পর্কে জেনে নিবেন;
- ফ্লিপ চার্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোচনা করা;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা।

সেশন সহায়ক প্রশ্নাবলী

০১. শস্যপর্যায়ের জন্য কি কোনো মৌসুমে জমি পতিত রাখা যায়?

০২. শস্যপর্যায় কম পক্ষে কত ব ছরের জন্য গ্রহণ করতে হবে?

০৩. বন্যা, খরা, আকস্মিক বন্যা ও লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় শস্যপর্যায় কি একই রকম হবে?

১.৪ সেশন সহায়ক নোট

শস্যপর্যায়

মাটির পুষ্টি উৎপাদনসমূহকে সর্বাধিক সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করা এবং মাটির ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক অবস্থা ফসলের সর্বাধিক উৎপাদনের জন্য উপযোগী রাখার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট জমিতে দুই বা ততোধিক ফসল নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বছরে বা একই বছরে বা একই বছরে বিভিন্ন মৌসুমে চাষ করার নাম শস্যপর্যায় বা শস্যচক্র। অর্থাৎ প্রতি বছর একই শস্য না জন্মিয়ে বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন ফসল পর্যায়ক্রমে জন্মানোকে শস্যপর্যায় বলা হয়।

সুবিধা: শস্যপর্যায় বা শস্যচক্র গ্রহণে অনেক সুবিধা রয়েছে। তা হলো-

০১. জমির উর্বরতা রক্ষা এবং মাটির অবস্থা ভালো থাকে;

০২. ক্ষতিকারক রোগ ও পোকা-মাকড়ের উপদ্রব থেকে রক্ষা;

০৩. নাইট্রোজেন যুক্তকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখে;

০৪. মাটির উর্বরতা রক্ষা করে;

০৫. বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত ব্যবহার করা যায়;
০৬. জমির উপযুক্ত ব্যবহার হয়;
০৭. মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়;
০৮. কেবল মানুষের খাদ্যই উৎপাদন হয় না পশু খাদ্যের উৎপাদন হয়;
০৯. ফসলের মাটিস্থ খাদ্যোপাদনের সুষ্ঠু অপসারণ হয়;
১০. গুচ্ছমূল জাতীয় ফসলের পরে প্রধান মূল জাতীয় গাছ জন্মানোর ফলে মাটির সুষ্ঠু ব্যবহার হয়।

সাধারণ শস্যপর্যায়ের নমুনা

	১ম খণ্ড জমি	২য় খণ্ড জমি	৩য় খণ্ড জমি	৪র্থ খণ্ড জমি	৫ম খণ্ড জমি
১ম বছর	আউশ আলু (আগাম) ভূট্টা	চিনা বাদাম রোপা আমন রবি-সবজি	আলু	আউশ মুলা ইক্ষু	পাট রোপা আমন ডাল শস্য
২য় বছর	পাট রোপা আমন ডাল শস্য	আউশ আলু (আগাম) ভূট্টা	চিনা বাদাম রোপা আমন রবি-সবজি	আলু	আউশ মুলা ইক্ষু
৩য় বছর	আউশ মুলা ইক্ষু	পাট রোপা আমন ডাল শস্য	আউশ আলু (আগাম) ভূট্টা	চিনা বাদাম রোপা আমন রবি-সবজি	আলু
৪র্থ বছর	আলু	আউশ মুলা ইক্ষু	পাট রোপা আমন ডাল শস্য	আউশ আলু (আগাম) ভূট্টা	চিনা বাদাম রোপা আমন রবি-সবজি
৫ম বছর	চিনা বাদাম রোপা আমন রবি-সবজি	আলু	আউশ মুলা ইক্ষু	পাট রোপা আমন ডাল শস্য	আউশ আলু (আগাম) ভূট্টা

শস্যপর্যায়ের জন্য নীতিমালা

০১. যে সব শস্য শস্যপর্যায়ভুক্ত করতে হবে সেগুলো সে স্থানের মাটি ও জলবায়ুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে;
০২. শস্যপর্যায়ভুক্ত ফসলগুলির চাহিদা সে এলাকায় থাকতে হবে;
০৩. এমনভাবে শস্যপর্যায় করতে হবে যেন জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়;
০৪. এমনভাবে শস্যপর্যায় তৈরি করতে হবে যেন পুরো বছর শ্রমিকের চাহিদা থাকে;
০৫. শস্যপর্যায়ে সবুজসার জাতীয় শস্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেন জৈব সার ও নাইট্রোজেন দ্বারা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ঘটে;
০৬. শস্যপর্যায়ের জন্য শস্য বাছাইকালে সেচ, নিকাশ, গুদামজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পোকা-মাকড় ও রোগবালাইয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে;
০৭. শহরের কাছাকাছি এলাকায় শুধু খাদ্যশস্য উৎপাদন না করে সবজি জাতীয় ফসল উৎপাদন করতে হবে;
০৮. মিল-কারখানার কাছে অধিক হারে এমন শস্য উৎপাদন করতে হবে-যা মিলে কাঁচামালের যোগান দিতে পারে যেমন- আখ, আখের মিলের কাছে;

০৯. মাটির উপরস্থ খাদ্য গ্রহণকারী ফসলের পর নিম্নস্তর হতে খাদ্য গ্রহণকারী ফসলের চাষ করা। অর্থাৎ গুচ্ছমূল জাতীয় ফসলের পর প্রধান মূল জাতীয় ফসল জন্মানো;
১০. অধিক খাদ্যগ্রহণকারীর পর অল্প পরিমাণ খাদ্যগ্রহণকারী গাছ জন্মানো যেমন আখের পর আউশ ধান, কলার পর বরবটি ইত্যাদি;
১১. তিন চার বছর পর কমপক্ষে এক মৌসুমের জন্য জমি খালি রাখা;
১২. শুষ্ক মৌসুমে গভীর মূল বিশিষ্ট ও বর্ষা মৌসুমে অগভীর মূল বিশিষ্ট ফসল চাষ করা।

বাংলাদেশে শস্যপর্যায়ের সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশে বিজ্ঞানভিত্তিক শস্যপর্যায় প্রয়োগযোগ্য নয়। তার কারণ হলো জলবায়ুর অবস্থা উন্নতমানের ভূমিকর্ষণের যন্ত্রপাতির অপর্যাপ্ততা, শস্য পর্যায় সম্বন্ধে কৃষকের জ্ঞানের স্বল্পতা ইত্যাদি। প্রধান প্রধান কারণগুলে হলো।

- যেহেতু বাংলাদেশের সর্বত্র বাৎসরিক বৃষ্টিপাত সমান নয় সেহেতু শস্যপর্যায় অনুসরণ কঠিন;
- ভূমির বন্ধুরতা বাংলাদেশের সর্বত্র এক নয়;
- মাটির ধরনও এক এক এলাকায় এক এক রকম;
- ভূমিকর্ষণ যন্ত্রের অপর্যাপ্ততা;
- যোগাযোগ ও বাজারব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হওয়ায় কৃষকের শস্য বিক্রয় এবং এর মূল্যের স্থিরতা না থাকার দরুণ তারা শস্যপর্যায় অনুসরণ করতে পারে না;
- কৃষককে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতিতে চাষ করার শিক্ষা প্রদানের সীমাবদ্ধতার জন্য শস্যপর্যায় এদেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়;
- যেহেতু ধান এবং পাটই এদেশের প্রধান ফসল তাই তারা অন্য ফসল উৎপাদনে উৎসাহ বোধ করে না।

১.৫ সেশন পরিকল্পনা

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ রোপণের গুরুত্ব

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। বনভূমি একদিকে যেমন মাটির উর্বরতা রক্ষা করে অন্যদিকে মাটির ক্ষয়রোধে সহায়তা করে। আমাদের দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২.৫৩ মিলিয়ন হেক্টর যা শতকরা হিসাবে মোট জমির ১৭.৫%। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি দেশের মোট আয়তনের অন্তত ২৫% বনভূমি থাকা প্রয়োজন। বনভূমির স্বল্পতায় প্রতিনিয়ত জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন দুর্যোগ যেমন- বন্যা, আকস্মিক বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা দেখা দিচ্ছে। ফলে ফসলের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে এবং গাছপালা ধ্বংস হচ্ছে। তাই দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধের পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য এবং স্থায়ীত্বশীল কৃষির জন্য আমাদের বনভূমির পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন।

সেশনের উদ্দেশ্য

সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- গাছ রোপণের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন;
- পরিবেশ রক্ষায় গাছের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: হোয়াইট বোর্ড মার্কার, ব্রাউন কাগজ/ফ্লিপ চার্ট, পেপার ক্লিপ, মাস্কিং টেপ।

সেশন পরিচালনার পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পর কেন এ সেশনটি নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করবেন;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে তাদের নিজ এলাকার কি কি গাছ রোপণ করা হয় তা জেনে নেবেন;
- এরপর অংশগ্রহণকারীদের সমান ৫টি দলে ভাগ করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে গাছ আমাদের কি উপকার করে সে সম্পর্কে জানতে চাইবেন;
- অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে জেনে নেবেন;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছ কি ভূমিকা পালন করে তা জেনে নেবেন;
- সারাংশ উপস্থাপন এবং অধিবেশন শেষ করবেন।

সেশন সহায়ক প্রশ্নাবলী

০১. একটি দেশের আয়তনের কত অংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন?
০২. গাছ আমাদের পরিবেশের কি উপকার করে?
০৩. দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় গাছ লাগানোর গুরুত্ব কি?
০৪. নদী ভাঙ্গন রোধে গাছের অবদান কি?

১.৫ সেশন সহায়ক নোট

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ রোপণের গুরুত্ব

আবহাওয়া ও জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাই এ কথা বলা যায়, বৃক্ষবিহীন পরিবেশ মস্তকবিহীন দেহের সমান। আমরা জানি এবং আন্তর্জাতিকভাবে বলা হয়ে থাকে দেশের পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। সে তুলনায় আমাদের রয়েছে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন মাত্র ১০ ভাগ বনভূমি এবং ৭ ভাগ গ্রামেগঞ্জে রোপিত বা সৃজিত বনভূমি। দেশের জনসংখ্যার তুলনায় যা অত্যন্ত সামান্য। এর ফলশ্রুতিতে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় ১৯টি জেলায় প্রতি বছর প্রচণ্ড ধূলিঝড়, সাইক্লোন, টর্নেডো, সিডর, নার্গিস ও আইলার মতো বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপকূলীয় এলাকায় মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতিসহ হাজারো মানুষ মারা যায়। বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং মরুময়তার ফলে বিজ্ঞানীদের আজ ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে কিভাবে পরিবেশ বিপর্যয় হতে বিশ্বকে রক্ষা করা যায়। বিগত কয়েক দশকে পৃথিবীর তাপমাত্রা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, বাতাসে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, মিথেন ও নাইট্রোস অক্সাডের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে ওজন স্তরে ফাটল সৃষ্টি হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে সূর্যরশ্মির ক্ষতিকর অতি বেগুনী রশ্মির মাত্রা বেড়ে সূর্য ও আলোর স্বাভাবিক বিকিরণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে মেরু অঞ্চল বিশেষ করে এন্টার্টিকা মহাদেশের (৯৮% বরফময়) বরফ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। গাছপালার কমতি বা ঘাটতি হলে পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এর ফলশ্রুতিতে মরুময়তা, অনাবৃষ্টি (রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) অসময়ে বৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, প্লাবণ, বিলম্ব বৃষ্টি, অতি খরা ও ঋতু পরিবর্তনসহ নানাবিধ বিপর্যয় পৃথিবীকে অশান্ত করে ফেলছে। এজন্য অধিক ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ব্যাপক হারে পরিকল্পিত বনায়নসহ উপকূলীয় চর এলাকায় ম্যানগ্রোভ প্রজাতি দ্বারা বনায়ন বা প্যারাবন সৃষ্টি অধিক টেকসই এবং লাভজনক।

বৃক্ষ রোপণের গুরুত্ব

আমাদের চারপাশের গাছ খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা মানবজাতির বেঁচে থাকা তথা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে অত্যন্ত প্রয়োজন। এটি সত্য যে গাছ ছাড়া আমরা এ সুন্দর গ্রহে বেঁচে থাকতে পারতাম না। গাছ যে কারণে অতীব গুরুত্বপূর্ণ-

- গাছ অক্সিজেন তৈরি করে যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন;
- গাছ মাটি পরিষ্কার করে অর্থাৎ মাটির বিষাক্ত পদার্থ ও মাটির অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ শুষে নিয়ে মাটিকে পরিষ্কার রাখে;
- গাছ বাতাস পরিষ্কার রাখে,বাতাসের ধূলিকণা ধরে রাখে, তাপ কমায় এবং বায়ু দূষণকারী পদার্থ যেমন- কার্বন-মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে;
- গাছ ছায়া দেয় এবং আবহাওয়া ঠাণ্ডা রাখে;
- গাছ মাটির ক্ষয় রোধ করে। গাছের শিকড় মাটিকে বেধে রাখে এবং গাছের পাতা বাতাসের গতি এবং বৃষ্টির গতিকে দমিয়ে রাখে যা মাটির ক্ষয়রোধে সহায়তা করে;
- গাছ যখন আবাসন গৃহে সৌন্দর্য বাড়ানোর কাজে ব্যবহার করা হয় তখন তার মূল্য অনেক বেড়ে যায়। তাই গাছ আবাসন সম্পদের মূল্য বাড়ায়;
- গাছ আমাদের বন্যা, আকস্মিক বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে।

১.৬ সেশন পরিকল্পনা

সার কি? সারের প্রকারভেদ। কৃষক পর্যায়ে সঠিক সার চেনার উপায়

জীবন ধারণ ও পুষ্টির জন্য মানুষের যেমন খাদ্যের দরকার তেমনই গাছেরও খাদ্যের দরকার। বায়ু ও মাটি থেকে গাছ নানা উপাদান সংগ্রহ করে পাতায় খাদ্য তৈরি করে। তবে গাছ শিকড়ের মাধ্যমে মাটি থেকেই অধিকসংখ্যক খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করে। মাটিতে বিদ্যমান খনিজ পদার্থ ও জৈব পদার্থ খাদ্য উপাদানের প্রাথমিক উৎস। নানাবিধ কারণ যেমন- ভূমিক্ষয়, ক্ষয়ীভবন, চুয়ানি প্রভৃতির ফলে মাটির খাদ্য উপাদান প্রতিনিয়ত কমে যাচ্ছে। সর্বোপরি মাটিতে নিবিড়ভাবে ফসল জন্মানোর ফলে অনবরত মাটি থেকে খাদ্য উপাদান অপসারিত হচ্ছে। এ অবস্থায় আশানুরূপ ফসল পেতে হলে কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য উপাদান বা সার সরবরাহ করে মাটিকে উৎপাদনক্ষম রাখতে হয়।

সেশনের উদ্দেশ্য

সেশন পরিচালনা শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- সেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা ও কৃষকের কি ধরনের উপকার হবে তা বলা;
- বিভিন্ন প্রকার সার সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ভেজাল সার শনাক্ত করতে পারবেন;
- উদ্ভিদের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সরেজমিনে ভেজাল সার পরীক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সময়: ৬০ মিনিট

উপকরণ: সঠিক সারের নমুনা, ভেজাল সারের নমুনা, পানি, প্লাস্টিক পট, সাদা কাগজ, হোয়াইট বোর্ড মার্কার, পেপার টেপ, র‍্যাপিং পেপার, মাপক সিলিন্ডার, ওজন মাপক যন্ত্র ইত্যাদি।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি:

- কুশল বিনিময় করে সেশন শুরু করা;
- সেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা ও কৃষকের কি ধরনের উপকার হবে তা বলা;
- বিভিন্ন ধরনের সারের নমুনা প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দেখানো এবং চেনানো;
- বিভিন্ন ধরনের ভেজাল সারের নমুনা প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দেখানো এবং চেনানো;
- ফসল উৎপাদনে সার কিভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখে সে বিষয়ে আলোচনা করা;
- আলোচনা সারাংশ করা ও উপসংহার।

সেশন সহায়ক প্রশ্নাবলী:

০১. ভেজাল সার কি মাটির ক্ষতি করে?
০২. কোন নির্দিষ্ট সার অধিক মাত্রায় ব্যবহার কি ক্ষতিকর?
০৩. সংরক্ষণের কারণে কি সারের গুণাগুণ বিনষ্ট হয়?

১.৬ সেশন সহায়ক নোট

সার কি? সারের প্রকারভেদ। কৃষক পর্যায়ে সঠিক সার চেনার উপায়

মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার জৈব ও রাসায়নিক সার আছে। এক প্রকার অসাধু ব্যবসায়ীর প্ররোচনায় বাজারে বিদ্যমান রাসায়নিক সারের পাশাপাশি ভেজাল সারও আছে। ভেজাল সার নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতি দ্বারা ভেজাল সার চিহ্নিত করতে পারলে তা কেনা ও ব্যবহার পরিহার করা যায়।

সার কি?

মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়ানো বা গাছের বাড়বাড়তির জন্য যে সকল পদার্থ গাছের খাদ্য হিসেবে মাটিতে প্রয়োগ করা হয় তাকে সার বলে।

সারের প্রকারভেদ

সাধারণত সার দু প্রকার জৈব সার ও রাসায়নিক সার।

জৈব সার: প্রাকৃতিকভাবে জীবদেহ হতে পাওয়া অথবা প্রস্তুতকৃত সারকে জৈব সার বলা হয়। জৈব সারে গাছের খাদ্য উপাদানসমূহ সব সময় সমান মাত্রায় পাওয়া যায় না। ছকে জৈব সারের শ্রেণি বিভাগ দেখানো হলো।

জৈব সার

নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ জৈব সার	ফসফরাস সমৃদ্ধ জৈব সার	পটাশ সমৃদ্ধ জৈব সার	সাধারণ জৈব সার
সরিষার খৈল, তিলের খৈল তিসির খৈল, বাদামের খৈল শুকনা রক্ত	হাড়ের গুঁড়া, মাছের গুঁড়া	কচুরিপানার ছাই, কাঠের ছাই	ধৈঞ্চা, শন, বরবটি ইত্যাদির পঁচা অংশ

রাসায়নিক সারঃ যে সব সার কৃত্রিম উপায়ে কারখানায় প্রস্তুত করা হয় তাকে রাসায়নিক সার বলে। রাসায়নিক সারে কাঙ্ক্ষিত উপাদানসমূহ সব সময় সমান মাত্রায় থাকে এবং এর মাত্রা জানা থাকে।

রাসায়নিক সার হলো ইউরিয়া, ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি), ট্রিপল সুপার ফসফেট (টিএসপি), মিউরেট অব পটাশ (এমওপি)

ভেজাল ইউরিয়া সার শনাক্তকরণের পদ্ধতি

১ চা চামচ (প্রায় ১ গ্রাম) ইউরিয়া সার ২ চা চামচ পরিমাণ পানির মধ্যে দিলে তাৎক্ষণিকভাবে গলে স্বচ্ছ দ্রবণ তৈরি করবে। এ দ্রবণে হাত দিলে ঠাণ্ডা অনুভূত হবে। যদি ইউরিয়া সারে চুন মিশ্রিত থাকে তবে ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন করবে। এটাই নাইট্রোজেন সার চেনার একমাত্র সহজ উপায়।

ভেজাল টিএসপি সার শনাক্তকরণের পদ্ধতি

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা প্রকারে ভেজাল টিএসপি সার তৈরি করা হয়। এ সারে ভেজালের ধরন পরীক্ষায় সরেজমিনে কোনো রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয় না।

- আসল টিএসপি সারে অম্ল স্বাদযুক্ত ঝাঁঝালো গন্ধ থাকবে। কিন্তু ভেজাল টিএসপি সারে অম্ল স্বাদযুক্ত ঝাঁঝালো গন্ধ থাকবে না;
- ১ চা চামচ টিএসপি সার আধা গ্লাস ঠাণ্ডা পানিতে মিশালে সার সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয়ে ডাবের পানির মতো পরিষ্কার দ্রবণ তৈরি করবে, পক্ষান্তরে ভেজাল টিএসপি সার পানিতে মিশালে ঘোলা দ্রবণ তৈরি করবে;
- প্রকৃত টিএসপি সার অধিক শক্ত বলে দুটো বুড়ো আঙ্গুলের নখের মাঝে রেখে চাপ দিলে সহজে ভেঙ্গে যাবেনা কিন্তু ভেজাল টিএসপি অপেক্ষাকৃত নরম হওয়ায় দুটো বুড়ো আঙ্গুলের নখের মাঝে রেখে চাপ দিলে সহজে ভেঙ্গে যাবে;
- ভেজাল টিএসটি সারের ভাঙ্গা দানার ভিতরের অংশের রঙ বিভিন্ন রকমের হতে হবে।

ভেজাল এমওপি সার শনাক্তকরণের পদ্ধতি

- আধা চা চামচ এমওপি সার আধা গ্লাস পানিতে মিশালে সঠিক এমওপি সার সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয়ে পরিষ্কার দ্রবণ তৈরি করবে;
- সারের নমুনায় কিছু অদ্রবণীয় বস্তু যেমন- বালি, কাঁচের গুঁড়া, মিহি সাদা পাথর, ইটের গুঁড়া ইত্যাদি মেশালে তা তলানী আকারে গ্লাসের নিচে জমা হবে;
- সারের নমুনায় লাল বা অন্য কোনো রঙ মিশালে পানির রঙ সেই অনুযায়ী হবে এবং রঙ ভেসে উঠবে। এছাড়া হাতে রঙ লেগে যাবে। সঠিক এমওপি সারের রঙ কখনো হাতে লেগে যাবে না।

১.৭ সেশন পরিকল্পনা

জৈব সার কি? মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়নে জৈব সারের গুরুত্ব ও জৈব সার তৈরির পদ্ধতি

পচনযোগ্য বাড়ির আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যে-কোনো আবর্জনাকে নিয়ম মাফিক পচিয়ে যে সার তৈরি করা যায় এবং জীব দেহ থেকে প্রাপ্ত অবশিষ্টাংশ, পশুপাখির মলমূত্র এবং গাছপালার অবশিষ্টাংশ যা মাটির উর্বরতা রক্ষা ও ফসলের অধিক ফলনের জন্য পচিয়ে তৈরি যে সার ব্যবহার করা হয় তাই জৈব সার। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় জৈব সার মাটিতে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং মাটিতে রস সঞ্চিত রাখে। ফসলী জমির মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ দিনকে দিন কমে যাচ্ছে। গবাদি পশু ও গোচারণ ক্ষেত্র কমে যাওয়ায় জমিতে জৈব পদার্থের যোগান দেয়া কমে যাচ্ছে। তাই জমিতে জৈব পদার্থ যোগান দেয়া অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। জৈব সার মানুষের খাদ্য নিরাপত্তায় বিরাট ভূমিকা রাখবে যা দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় খুবই কার্যকরী।

সেশনের উদ্দেশ্য

সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ জানতে পারবেন-

- জৈব সার ও এর প্রকারভেদ;
- জৈব সারের গুরুত্ব;
- জৈব সার তৈরির পদ্ধতি।

সময়ঃ ৬০ মিনিট

উপকরণঃ স্কেল, হোয়াইট বোর্ড মার্কার, ব্রাউন পেপার, হোয়াইট বোর্ড, ফ্লিপচার্ট, পেপার ক্লিপ, পেপার টেপ।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময় করে সেশন শুরু করা;
- সেশনে তাদের কি উপকার হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়া;
- প্রশিক্ষণার্থীগণ জমিতে কি কি জৈব সার ব্যবহার করেন তা জানতে চাওয়া এবং এর যে-কোনো একটি জৈব সার তৈরির পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে বলা;
- জৈব সার তৈরির বিভিন্ন ধাপগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেয়া। এ ক্ষেত্রে জৈব সার তৈরির বিভিন্ন পোস্টার, লিফলেট প্রদর্শন করা;
- উপস্থাপনের পর তাদেরকে প্রশ্ন করা এবং ভালোভাবে জানতে সহায়তা করা।

সেশন সহায়ক প্রশ্নাবলী

০১. কোন ধরনের জৈব সার অধিকতর কার্যকরী?
০২. মাটির গুণাগুণ উন্নয়নে জৈব সারের ভূমিকা কি?
০৩. এক সাথে জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করা যাবে কি?

১.৭ সেশন সহায়ক নোট

জৈব সার কি? মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়নে জৈব সারের গুরুত্ব ও জৈব সার তৈরির পদ্ধতি

মাটির গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য কিংবা মাটিতে উদ্ভিদের একাধিক খাদ্য উপাদানের ঘাটতি পূরণ করার স্বার্থে জৈব সারের ব্যবহার বাড়াতে হবে। জৈব সারে উদ্ভিদের প্রায় সব খাদ্য উপাদান কম বেশি আছে। মাটিকে জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ করতে পারলে মাটির ভৌতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ফসল আবাদের অধিকতর উপযোগী করে তোলা যায়। জৈব সার তৈরি ও ব্যবহারের প্রতি কৃষকদের ব্যাপক হারে সচেতন করতে হবে।

বিভিন্ন প্রকার জৈব সার

খামারজাত সার: গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি গৃহপালিত জীবজন্তুর মলমূত্র মিশ্রিত খড়কুটো সহযোগে খামারের এক পাশে জমা করা হয় এবং পচনের ফলে যে সার তৈরি হয় সেটিই খামারজাত সার।

গোবর সার: গোবর একটি জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত জৈব সার। গোবর পচন ও সংরক্ষণ ঠিকমত না হলে জৈব সার হিসেবে এর মান অনেক কমে যায়। তাই গোবর উত্তমরূপে পচিয়ে ব্যবহার করা উচিত। যে জমিতে উপর্যুপরি ফসল ফলানো হয় সে জমিতে ভালোভাবে পঁচা গোবর ব্যবহার করে ভালো ফলন পাওয়া যায়। গোবর সার কোনোভাবেই কাঁচা অবস্থায় জমিতে দেয়া যাবে না।

কম্পোস্ট সার: একাধিক পচনশীল পদার্থ স্তরে স্তরে সাজিয়ে এ সার তৈরি করা হয়। কম্পোস্ট তৈরির কাজে কচুরিপানা একটি উৎকৃষ্ট উপাদান। এর সাথে আগাছা, শস্যের অবশিষ্টাংশ, লতাপাতা, জংলা ও বিভিন্ন পচন দ্রব্য ব্যবহারে কম্পোস্ট তৈরি করা যায়। এছাড়া আবর্জনা সার, হাঁস মুরগির বিষ্ঠা, খৈল, হাড়ের গুঁড়ো, মাছের গুঁড়ো, ছাই ইত্যাদি উৎকৃষ্ট জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

জৈব সারের গুরুত্ব

- জৈব সার গাছের শিকড় ও অঙ্গজ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে;
- মাটির গঠন ও গুণাগুণ উন্নত করে। বেলে মাটিতে রস মজুদ রাখতে সাহায্য করে, পানির ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়;
- জৈব সার ফসলের উৎপাদন বাড়ায়, গুণগত মান বাড়ায় এবং গুদামজাত শস্যের সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ায়। যতই মাটিতে জৈব পদার্থ বেশি থাকবে ততই মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বেশি হবে;
- জৈব সার ব্যবহারে মাটির উপকারী জীবাণুর কার্যক্রম বেড়ে যায় এবং এদের বংশ বিস্তারের সহায়ক হয়। এতে সহজভাবে গাছ মাটি থেকে খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে দ্রুত বড় হতে পারে;
- মাটিতে জৈব সার ব্যবহারের পর ধীরে ধীরে গাছের প্রয়োজন অনুযায়ী অনেক দিন ধরে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান গ্রহণ উপযোগী থাকে। জমিতে প্রয়োগের পর আনুমানিক ৬ মাস থেকে ১৮ মাসব্যাপী এর প্রভাব থাকতে পারে। এতে পরবর্তী ফসলেও কাজে লাগে;
- গ্রীষ্মকালে মাটিতে তাপমাত্রা কমিয়ে দেয় এবং শীতকালে মাটিকে উষ্ণ রাখতে সাহায্য করে। এতে সব ঋতুতে সারা বছরব্যাপী গাছের শিকড় বাড়তে পারে;
- জৈব সার রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে এবং জৈব সার ব্যবহার করলে আনুপাতিক হারে রাসায়নিক সারের মাত্রা কমানো যায়;

- জৈব সার মাটির বুনটের গঠন উন্নত করে এবং মাটিকে যে-কোনো ফসল চাষাবাদের উপযোগী করে তোলে;
- জৈব সার জমির আর্দ্রতা রক্ষায় বিশেষভাবে সহায়তা করে এবং মাটিকে ফসল আবাদের উপযোগী প্রয়োজনীয় জো অবস্থা আনতে সাহায্য করে।

জৈব সার তৈরির পদ্ধতি

- বসতভিটা সংলগ্ন গোয়াল বা বাড়ির আশপাশে সুবিধামত একটি স্থান নির্বাচন করা যেতে পারে। স্থানটি অপেক্ষাকৃত উঁচু হতে হবে যাতে বন্যার পানি প্রবেশ করতে না পারে;
- আনুমানিক ১.৫ মিটার লম্বা ১.০ মিটার চওড়া এবং ১.০ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট ২টি গর্ত তৈরি করতে হবে। জায়গার অবস্থান ও চাহিদা অনুযায়ী দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের হেরফের হতে পারে। গর্তের চারিদিকে ৩০ সেন্টিমিটার উঁচু আইল বেঁধে দিতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি গর্তে ঢুকতে না পারে। বৃষ্টি এবং সূর্যের তাপ থেকে রক্ষার জন্য গর্তের উপর চালা দিতে হবে। চালার ছাউনী যেন কমপক্ষে দুই বছর স্থায়ী হয় সেভাবে তৈরি করতে হবে;

- গর্তের তলদেশ এবং চারপাশ গোবরগোলা কাদামাটি দিয়ে লেপে দিতে হবে যাতে খাদ্য উপাদান চুইয়ে না যায়। শোষণকারী স্তর হিসেবে গর্তের তলায় খড় বিছিয়ে দিতে হবে;
- আমাদের গৃহস্থালীর দৈনন্দিন নানা রকম বর্জ্য যেমন- গোবর, পচনশীল তরিতরকারির অবশিষ্টাংশ, ছাগল ও হাঁস মুরগির বিষ্ঠা, খামারের পরিত্যক্ত খড়কুটো ও অন্যান্য শস্যের অবশিষ্টাংশ গর্তে ফেলতে হবে। সব রকমের আবর্জনা ভালোভাবে মিশিয়ে সমান করতে হবে;
- গর্তে স্তূপীকৃত আবর্জনা স্তর ২০ সেন্টিমিটার উঁচু হলে এক মুঠো ইউরিয়া সার স্তূপের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। গর্ত পুরোপুরি ভর্তি হয়ে গেলে উপরিভাগ মাটি দিয়ে লেপে দিতে হবে। গর্তের আবর্জনা শুকিয়ে গেলে গো-চনা বা পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। এভাবে রাখার ৩ মাস পর ব্যবহার উপযোগী হবে। পরবর্তীতে অন্য গর্তটি একই ভাবে ভরতে হবে।

১.৮ সেশন পরিকল্পনা

বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে মাশরুম চাষের গুরুত্ব এবং উৎপাদন কলাকৌশল

বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় মাশরুম চাষ একটি গুরুত্বপুর্ণ অভিযোজন কৌশল। লবণাক্ততা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রায় অন্যান্য ফসল নষ্ট হলেও ঘরের ভিতর অল্প জায়গায় চাষ করার কারণে মাশরুম জলবায়ুর বিরূপ পরিবেশেও উৎপাদন অব্যাহত রাখে। খুবই সামান্য খরচে উৎপাদিত মাশরুমের উচ্চ বাজার মূল্যও রয়েছে। তাছাড়া বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলার পাশাপাশি মাশরুম চাষ দ্বারা নারীর কর্মক্ষেত্র এবং ক্ষমতায়নকে বাড়ায়।

সেশনের উদ্দেশ্য

- বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে মাশরুম চাষের গুরুত্ব এবং উৎপাদন কলাকৌশল জানা;
- বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুতে মাশরুম চাষের উপযোগিতা জানা;
- মাশরুম চাষের নিয়মাবলী ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব জানা।

সময়: ৬০ মিনিট

উপকরণ: হোয়াইট বোর্ড মার্কার, বাউন পেপার/সাদা বড় কাগজ, হোয়াইট বোর্ড, ফ্লিপ চার্ট, পেপার টেপ ইত্যাদি।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশলাদি বিনিময়ের মাধ্যমে শুরু করা;
- সেশনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা এবং কৃষকের কি ধরনের উপকার হবে তা বলা;
- সেশনের বিষয় ফ্লিপচার্টের উপরে লেখা, প্রয়োজনে বুলেট পয়েন্ট লিখে উপস্থাপন করা;
- মাশরুম চাষ কলাকৌশল বা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়া;
- মাশরুম চাষের কৌশল সরেজমিনে পরিদর্শন করা;

- প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করে সেশনের ফিরতি বার্তা নেওয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা।

সেশন সহায়ক প্রশ্নাবলী

০১. মাশরুম খাবারের কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কি?
০২. স্পন কোথায় পাওয়া যায়?
০৩. মাশরুম চাষে স্প্রে করার সময় কোন্ কোন্ বিষয়ে নজর দেওয়া জরুরি?

১.৮ সেশন সহায়ক নোট

বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে মাশরুম চাষের গুরুত্ব এবং উৎপাদন কলাকৌশল

মাশরুম একটি পুষ্টিকর, সুস্বাদু এবং ওষুধিগুণ সম্পন্ন সবজি যাতে ২৫-৩৫% প্রোটিন ও ৬৫% খনিজ পদার্থ আছে। মাশরুম চাষে কোনো জমির প্রয়োজন পড়ে না। ঘরের এক কোণে চাষ করা যায়। যে-কোনো বয়স ও শ্রেণির মহিলা, শিশু, ছাত্র, চাকুরিজীবী, প্রতিবন্ধী সবাই চাষ করতে পারে। লবণাক্ততা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রায় অন্যান্য ফসল নষ্ট হলেও মাশরুম জলবায়ুর বিরূপ পরিবেশ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ঘরের মধ্যে, বারান্দায়, ছাদের উপর এবং অন্য যে-কোনো জায়গায় বাঁশ বা সহজলভ্য অন্যান্য উপাদান দিয়ে র‍্যাক তৈরি করে চারপাশে চট দিয়ে আবৃত করে উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে মাশরুম চাষ করা যায়।

মাশরুমের সংজ্ঞা

মাশরুম হলো এক ধরনের খাওয়ার উপযোগী মৃতজীবী ছত্রাকের ফলন্ত অংশ। অসংখ্য ছত্রাকের মধ্য থেকে দীর্ঘ যাচাই ও বাছাই করে যেসব ছত্রাক সম্পূর্ণ খাওয়ার উপযোগী, পুষ্টিকর ও সুস্বাদু সেগুলোকেই বিজ্ঞানীরা মাশরুম হিসেবে গণ্য করেছেন। সুতরাং ব্যাঙের ছাতা এবং মাশরুম এক জিনিস নয়। ব্যাঙের ছাতা প্রাকৃতিকভাবে যত্রতত্র গজিয়ে ওঠে কিন্তু মাশরুম পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ করা সুস্বাদু, পুষ্টিকর এবং ওষুধিগুণ সম্পন্ন সবজি, যা সম্পূর্ণ হালাল।

মাশরুম চাষের গুরুত্ব

- ১০০ গ্রাম শুকনা মাশরুমে ২৫-৩৫ গ্রাম প্রোটিন থাকে যা অন্যান্য যে-কোনো প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার থেকে বেশি;
- মাশরুম চাষে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে;
- মাশরুম দিয়ে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য যেমন- মাশরুম ফ্রাই, মাশরুম স্যুপ, মাশরুম চিংড়ি, মাশরুম সস এবং মাশরুম দিয়ে মেয়েদের মুখের প্রসাধনের কাজে ব্যবহার করা যায়;
- পুষ্টিগুণের কারণে মাশরুমকে অধিকাংশ মরণব্যাধি যেমন- ডায়াবেটিস, এইডস, উচ্চরক্তচাপ, ক্যান্সার/টিউমার, রক্ত শূন্যতা ইত্যাদির প্রতিরোধক এবং নিরাময়ক হিসেবে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা মনে করছেন।

মাশরুম চাষের সুবিধাসমূহ

- বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু মাশরুম চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। সেই সাথে মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণও (যেমন- খড়, কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি) সহজলভ্য।
- মাশরুম চাষের জন্য জমির দরকার হয় না;
- ঘরের মধ্যে চাষ করা যায়;
- ৭-১০ দিনের মধ্যে মাশরুমের ফলন পাওয়া যায় যা অন্য কোনো ফসলের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়;
- বাড়ির যে কেউ মাশরুম চাষে অংশগ্রহণ করতে পারে;
- কম পুঁজির দরকার হয় এবং বিনিয়োগকৃত অর্থ অল্প সময়ের মধ্যে তুলে আনা সম্ভব;
- একর প্রতি ফলন বেশি এবং বাজার মূল্যও বেশি।
- মাশরুম চাষে নারীর ক্ষমতায়ন এবং বেকারত্বের অবসান ঘটে।

মাশরুম চাষঘরের পরিবেশ

মাশরুম চাষঘর তৈরির জন্য যে সব বিষয়ের উপরে নজর দিতে হবে-

০১. অক্সিজেনের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার জন্য ঘর থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করার ব্যবস্থা থাকতে হবে অর্থাৎ ঘরের মধ্যে ক্রস ভেন্টিলেশন অথবা ভেন্টিলেটর যা ঘরের নিচের অংশ দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড বের হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে;

০২. মাশরুমের ফ্রুটিংবডি গজানোর জন্য তাপমাত্রার প্রয়োজন ২০-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এর বেশি অথবা কম তাপমাত্রা হলে মাশরুমের ফলন ও মান দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হয়;

০৩. মাশরুম আর্দ্র অবস্থা পছন্দ করে। সুতরাং চাষ ঘরে মাশরুম প্যাকেটের চারপাশে উচ্চ মাত্রার আর্দ্রতা বজায় রাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে;

০৪. মাশরুম ঘরটি আবছা আলোযুক্ত হতে হবে যেন একজন লোক খালি চোখে খবরের কাগজ পড়তে পারেন।

মাশরুমের প্যাকেট সংগ্রহ ও কর্তন

প্যাকেট সংগ্রহ

চাষঘর তৈরির পর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে মাশরুমের মান সম্পন্ন বীজ বা স্পন সংগ্রহ করতে হবে। ভালো স্পনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- প্যাকেটটি সুষমভাবে মাইসিলিয়াম দিয়ে পূর্ণ সাদা হবে, কোনো অংশ সাদা অথবা হলুদ, লাল বা কালো রঙের হলে সেটা মান সম্পন্ন প্যাকেট নয় বলে বুঝতে হবে। মানসম্পন্ন বীজ সংগ্রহের পর যথাসম্ভব ঠাণ্ডা পরিবেশে প্যাকেট পরিবহন করে নিয়ে তাড়াতাড়ি প্যাকেট কাটার ব্যবস্থা নিতে হবে। যদি কয়েকদিন রেখে প্যাকেট কাটতে হয় তবে প্যাকেটগুলোকে ঘরের ঠাণ্ডা জায়গায় বস্তা থেকে বের করে আলাদা আলাদা করে রাখতে হবে। রাখার জায়গার তাপমাত্রা ২৫০ সেন্টিগ্রেডের মধ্যে হলে প্যাকেটে ১ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। মাইসিলিয়াম পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই স্পন প্যাকেট কাটার উপযুক্ত সময়। তাই প্যাকেট সংগ্রহের সাথে সাথে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি প্যাকেট কেটে চাষ ঘরে বসানো উচিৎ।

প্যাকেট কাটা

চাষ ঘরে বসানোর আগে স্পন প্যাকেট সঠিক নিয়মে কেটে চেছে পানিতে চুবিয়ে নেয়া প্রয়োজন। স্পন প্যাকেটের কোণাযুক্ত দু কাঁধ বরাবর প্রতি কাঁধে ২ ইঞ্চি লম্বা এবং ১ ইঞ্চি নিচে ব্যাস করে 'উ' আকারে পিপি কেটে ফেলতে হবে। উভয়পার্শ্বের এ কাটা জায়গা ব্লেড দিয়ে সাদা অংশ চেঁছে ফেলতে হবে। এ কাটা ও চাঁছা প্যাকেটকে ৫-১৫ মিনিট পানিতে উপুড় করে চুবিয়ে ভালোভাবে পানি ঝরিয়ে সরাসরি চাষ ঘরের মেঝে অথবা তাকে সারি করে লাজিয়ে চাষ করতে হবে।

পরিচর্যা

চাষ ঘরে মেঝে অথবা র‍্যাকে মাশরুম স্পন ২ ইঞ্চি পর পর সাজিয়ে পরিচর্যা করলে মাশরুমের ফলন ভালো পাওয়া যায়। স্পন প্যাকেটের চারপাশের আর্দ্রতা ৭০-৮০% রাখার জন্য গরমের দিনে ৪ থেকে ৫ বার, শীতে ও বর্ষার দিনে ২ থেকে ৩ বার (প্রয়োজনে কমবেশি) পানি স্প্রে করতে হবে যেন প্যাকেট ও এর আশপাশে ভেজা ভেজা ভাব থাকে কিন্তু পানি জমে না থাকে। স্প্রে করার সময় স্প্রেয়ারের নজল প্যাকেটের ১ ফুট উপরে রেখে পানি এমনভাবে স্প্রে করতে হবে যেন কাটা জায়গায় অংকুরের উপর সরাসরি পানির ফোঁটার আঘাতে অংকুর ভেঙে না যায়। তবে পানি ভোরে সূর্য ওঠার আগে এবং সূর্য ডোবার পরে স্প্রে করলে ফলন বহুগুণ বেড়ে যায়। এছাড়া আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা সংরক্ষণের জন্য তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কখনো স্পন প্যাকেটের উপর খবরের কাগজ ভিজিয়ে, কখনো লম্বা পলিথিন শিট ছিদ্র করে, কখনো পুরু চটের বস্তা ভিজিয়ে প্যাকেটের উপরে একটু উঁচু করে রেখে আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। গরমের দিনে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে স্প্রে দিয়ে বৃষ্টির মতো ঘরের দেয়াল এবং মেঝে কয়েকবার ভিজিয়ে দিলে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

মাশরুম চাষে অন্যান্য পরিচর্যা হচ্ছে-

- মাশরুম ঘরের চারপাশ সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;
- পরিচর্যা ঠিক হচ্ছে কিনা তা বোঝার উপায় হচ্ছে ২-৩ দিনের মধ্যে মাশরুমের অংকুর পিনের মতো বের হবে;

- ৫-৭ দিনের মধ্যে মাশরুম তোলার উপযোগী হবে;
- যদি এক সাথে অনেকগুলো অঙ্কুর আসে তবে সম আকারের মানসম্পন্ন মাশরুম পাওয়ার জন্য নিচের ছোট অঙ্কুরগুলো ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে ফেলতে হবে এবং প্রতি পাশের থোকায় ৮ থেকে ১২টি ফ্রুটিং বডি (৫০০ গ্রাম প্যাকেট) রাখতে হবে;
- প্রথমবার মাশরুম তোলার পর প্যাকেট ১ দিন বিশ্রাম অবস্থায় রাখতে হবে এবং পরের দিন আগের কাটা অংশে পুনরায় চামচ দিয়ে চেঁছে ফেলে পূর্বের ন্যায় পানি স্প্রে করতে হবে;
- একইভাবে ১টি প্যাকেট থেকে ৮ থেকে ১০ বার মাশরুম সংগ্রহ করা যায়, তবে বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য ৫/৬ বার সংগ্রহ করা উচিৎ। এতে একটি প্যাকেট থেকে ন্যূনতম ২০০ থেকে ২৫০ গ্রাম মাশরুম পাওয়া যাবে;
- ভালো মাশরুম পাওয়ার জন্য এবং স্বাভাবিক অবস্থায় বেশি সময় মাশরুম সংরক্ষণের জন্য সংগ্রহের পূর্বে অন্তত ১২ থেকে ১৫ ঘন্টা মাশরুমের গায়ে সরাসরি পানি স্প্রে করা যাবে না;
- একটি প্যাকেট থেকে ৭৫ দিন থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত ভালোভাবে মাশরুম পাওয়া যায় (প্যাকেট যতদিন সাদা থাকে)। স্পন প্যাকেট থেকে মাশরুম উৎপাদন শেষ হলে প্যাকট চাষ ঘর থেকে সরিয়ে পিপি খুলে পঁচা কাঠের গুঁড়ার কম্পোস্ট একটি গর্তের মধ্যে রেখে সার হিসেবে অন্যান্য গাছপালায় ব্যবহার করা যাবে।

১.৯ সেশন পরিকল্পনা

বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে মৌমাছি পালন

সুপ্রাচীনকাল থেকেই মৌমাছি একটি অত্যন্ত উপকারী পতঙ্গ হিসাবে পরিচিত। এ কঠোর পরিশ্রমী, সঞ্চয়ী এবং সামাজিক পতঙ্গটি পরাগায়নের মাধ্যমে আমাদের অধিক ফসল উৎপাদনে সহায়তা করে এবং মধু, মোম প্রভৃতি দিয়ে থাকে যা আমাদের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখতে সহায়ক। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অল্প পুঁজি, স্বল্প শ্রম এবং সামান্য কারিগরী জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মৌ-চাষ করা সম্ভব। মৌচাষের মাধ্যমে ফল ও ফসলের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। পুষ্ট ও ভালো বীজ উৎপাদিত হয়। ফসলের পাশাপাশি বিশুদ্ধ মধু, মোম, মৌমাছি উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয় হয়। উৎপাদিত বিশুদ্ধ মধু কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, সুস্বাস্থ্য অর্জন এবং রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিরাময়ে সহায়ক। পুষ্টি ঘাটতি পূরণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। তাছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনে পরিবেশবান্ধব অভিযোজন এবং বিকল্প আয়ের উৎস হিসাবে মৌমাছি পালন একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মৌচাষকালে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে মৌমাছি কোনো কারণে প্রাণনাশের বা অন্য কোনো দুর্ঘটনার সম্মুখীন না হয়।

সেশনের উদ্দেশ্য

এ সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে মৌ-চাষের গুরুত্ব বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মৌ-চাষ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন;
- স্বল্প পরিসরে মৌ-চাষ করতে পারবেন;
- খাঁটি মধুর বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতা জানতে পারবেন।

সময়: ৬০ মিনিট

উপকরণ: প্রদর্শন সামগ্রী (মৌ-চাষের ফ্লিপ চার্ট), মৌ বাক্স, পোস্টার পেপার, মার্কার, পেপার টেপ ইত্যাদি।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- শুভেচ্ছা ও কুশলাদি বিনিময় করে অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানানো;
- অধিবেশনে অংশগ্রহণ করার সুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়া;
- ফ্লিপ চার্ট (মৌ-চাষ)/পোস্টার টাঙ্গিয়ে ধারাবাহিকভাবে মৌমাছি পালনের ধাপসমূহ উপস্থাপন করা;
- মৌমাছির বাক্স প্রদর্শন করে হাতে কলমে শিখানো;
- উপস্থাপন শেষে অংশগ্রহণকারীদের নিকট প্রশ্ন আহ্বান করে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়া;
- সার্বিক আলোচনার পর অংশগ্রহণকারীদের নিকট প্রশ্ন আহ্বান করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ উত্তর দেয়া। ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করা এবং পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে অবহিত করা।

সেশন সহায়ক প্রশ্নাবলী

- মৌমাছি কামড়ালে কি ব্যবস্থা নিতে হবে?
- যখন ফুল থাকে না তখন মৌমাছি বাঁচানোর জন্য কি করতে হবে;
- মধু দীর্ঘ দিন সংরক্ষণ কিভাবে করা যায়?

১.৯ সেশন সহায়ক নোট

বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে মৌমাছি পালন

সুপ্রাচীনকাল থেকেই মৌমাছি একটি অত্যন্ত উপকারী পতঙ্গ হিসেবে পরিচিত। এ কঠোর পরিশ্রমী, সঞ্চয়ী এবং সামাজিক পতঙ্গটি পরাগায়নের মাধ্যমে আমাদের অধিক ফসল উৎপাদনে সহায়তা করে, ফসলের পাশাপাশি বিশুদ্ধ মধু, মোম, মৌমাছি উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয় হয়। উৎপাদিত বিশুদ্ধ মধু কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, সুস্বাস্থ্য অর্জন এবং রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিরাময়ে সহায়ক। পুষ্টি ঘাটতি পূরণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনে পরিবেশবান্ধব অভিযোজন এবং বিকল্প আয়ের উৎস হিসাবে মৌ-চাষ একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

মৌমাছি পালন

মৌমাছিকে তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে ধরে এনে বসবাস উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে বাক্সের মাধ্যমে প্রতিপালন করাকে মৌমাছি পালন বলা হয়।

মৌমাছি পালনের গুরুত্ব

- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অল্প পুঁজি, স্বল্প শ্রম এবং সামান্য কারিগরী জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মৌ-চাষ করা সম্ভব।
- মৌ-চাষের মাধ্যমে ফল ও ফসলের উৎপাদন অনেক বেড়ে যায়।
- পুষ্ট ও ভালো বীজ উৎপাদন হয়।
- ফসলের পাশাপাশি বিশুদ্ধ মধু, মোম, মৌমাছি উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয় হয়।
- উৎপাদিত বিশুদ্ধ মধু কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, সুস্বাস্থ্য অর্জন এবং রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিরাময়ে সহায়ক।
- পুষ্টি ঘাটতি পূরণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।

খাঁটি মধুর বৈশিষ্ট্য

- খাঁটিমধু মিষ্টি স্বাদযুক্ত, সুস্বাদু এবং অম্লভাবাপন্ন;
- দেখতে পরিষ্কার, কোনো ঘোলাটে ভাব থাকে না;
- সিরাপের মতো তরল, আঠালো এবং স্বচ্ছ;
- ফুলের উৎস অনুযায়ী স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণের হয়;
- ঠাণ্ডায় দানা বাঁধে (১০-১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে);
- জলীয় অংশ ১৮-২০ ভাগ;
- মধু পানির চেয়ে ভারী। পানিতে মধু দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে না মিশালে কিছুক্ষণ পরই তা পাত্রের নিচে জমা হয়।

মধুর উপকারিতা

মধুতে উচ্চমান সম্পন্ন বহু উপাদান থাকায় মধু পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে দৈহিক গঠনে এবং বিভিন্ন রোগের ওষুধসহ আরও বহুবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়ে আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে।

পরাগায়নের সুফল

ফল ও ফসল উৎপাদনের মূল শর্ত পরাগায়ন। পরাগায়ন নিশ্চিত করতে পারে একমাত্র মৌমাছিসহ অন্যান্য উপকারী কীট-পতঙ্গ। একই ফুলে মৌমাছি একাধিকবার বিচরণ করার ফলে জমির ফসলের পরাগায়ন ৯৫% নিশ্চিত হয়। পরাগায়নের কারণে সরিষার ফলন ৬৭% এবং তিল জাতীয় ফসলের ৩৫% উৎপাদন বেড়ে যায়। মূল কথা মৌমাছি উদ্ভিদকে সাহায্য করে, উদ্ভিদ মৌমাছিকে সাহায্য করে আর মানুষ উভয়ের ফল ভোগ করে।

মৌমাছি পালন করতে যা প্রয়োজন

- মৌ-কলোনি
- মৌ-চাষ উপযোগী এলাকা
- মৌ-চাষ উপকরণ
- মৌমাছির পরিচর্যা বিষয়ক জ্ঞান

০১. মৌ-কলোনি

মৌ-কলোনি বলতে মৌমাছির পরিবারকে বুঝায়, যা মৌচাকে বসবাসরত মৌমাছির সকল সদস্য নিয়ে গঠিত। একটি কলোনিতে ৫-৭৫ হাজার মৌমাছি থাকতে পারে। যার মধ্যে মাত্র একটি রাণী মৌমাছি, কয়েকশত পুরুষ মৌমাছি এবং বাকি সবগুলো শ্রমিক মৌমাছি। কলোনিতে অন্যান্য মৌমাছিরা রাণীকে ঘিরে অবস্থান করে এবং রাণী দ্বারাই মৌ-কলোনি নিয়ন্ত্রিত হয়।

রাণী মৌমাছি

কলোনির মূল প্রাণ বলতে রাণীকেই বুঝায়। রাণী আকারে পুরুষ ও শ্রমিক মৌমাছির চেয়ে বড়। রাণী মৌমাছির একমাত্র কাজ ডিম পাড়া। এরা গড়ে প্রতিদিন ১-৩ হাজার ডিম পারে। একটি রাণী সাধারণত এক থেকে দেড় বছর পর্যন্ত অধিক হারে ডিম দিয়ে থাকে। কৃত্রিম উপায়ে গ্রাফটিং পদ্ধতিতে একসঙ্গে অনেকগুলো রাণী তৈরি করা যায়। গ্রাফটিং রাণী ব্যবহার করে কলোনি বিভাজন, নবায়ন এবং রাণীহীন কলোনিতে প্রতিস্থাপন করা যায়।

পুরুষ মৌমাছি

অনিষিক্ত ডিম থেকে পুরুষ মৌমাছি তৈরি হয়। এদের আকৃতি বেশ মোটা গায়ের রঙ কালচে হওয়ায় কলোনিতে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। এদের প্রধান কাজ হল কুমারী রাণীর সাথে মেটিং করা।

কর্মী মৌমাছি

সাধারণত নিষিক্ত ডিম থেকে অপ্রজননক্ষম যে পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি হয় তাদেরকে কর্মী মৌমাছি বলে। এরা আকারে রাণী বা পুরুষ মৌমাছির চেয়ে ছোট। একটি কলোনির যাবতীয় কাজই কর্মী মৌমাছি করে। এরা জন্মের পর থেকেই বয়সভিত্তিক শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে ঝাড়ুদার, সেবিকা, কারিগর, যোগাযোগকারী, পাহারাদার, সন্ধানকারী ও সংগ্রহকারী হিসেবে কলোনির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজগুলো অত্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে করে থাকে।

মৌমাছির প্রজাতি

বাংলাদেশে মোট চার প্রজাতির মৌমাছি দেখা যায়। এর মধ্যে এপিস মেলিফেরা এবং এপিস সিরেনা মৌমাছি বাণিজ্যিকভাবে মধু উৎপাদনের জন্য চাষ করা হয়। তবে মেলিফেরা তুলনামূলকভাবে সিরেনা থেকে মধু উৎপাদন ক্ষমতা ৫/৬ গুণ বেশি । তা ছাড়া মেলিফেরা মৌমাছির বংশ বৃদ্ধি, কলোনি ব্যবস্থাপনা তুলনামূলকভাবে সহজ। কারণ তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি, শান্ত প্রকৃতির হয়, এদের বাক্স ছেড়ে গৃহ ত্যাগ করার প্রবণতা কম এবং একত্রে ১ শত এর অধিক কলোনি এক সঙ্গে রেখে মধু উৎপাদন করা যায়।

০২. মৌচাষ উপযোগী এলাকা

যে এলাকায় মৌ-চাষ করা হবে সে এলাকা এক থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে মধুর উৎস উপযোগী গাছপালা ও রবি শস্য আবাদ থাকা প্রয়োজন। যেমন- সরিষা, লিচু, ধনিয়া, কালোজিরা, সাজনা, তিল, বরই, সূর্যমুখী, জলপাই, কামরাঙ্গা, ধৈঞ্চা, নারিকেল, খলিসি, কেওড়া, বাইন প্রভৃতি।

০৩. মৌ-চাষ উপকরণ

মৌ-চাষের জন্য যে সমস্ত উপকরণ প্রয়োজন তা হলো- মৌবাক্স, মধুনিষ্কাশন মেশিন, মুখোশ, ধুঁয়াদানী, চাকু, কুইন প্রভৃতি।

০৪. মৌমাছির পরিচর্যা বিষয়ক জ্ঞান

Community Based Api-Culture Demonstration at Kuistara in Horirampur of Manikgonj (Collection Honey) - DCRMA

- **উপযোগী স্থান নির্বাচন-** কলোনি বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান ও পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রাকৃতিক খাবার হিসেবে পোলেন ও নেকটারের প্রাচুর্যতা। প্রকৃতিতে এ খাবার যে এলাকায় বেশি রয়েছে সেখানে কলোনি স্থানান্তর করে মৌমাছি বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা। বর্ষাকালীন পরিচর্যার অংশ হিসাবে ধৈঞ্চা, নারকেল, লাউ, তিল, কুমড়া, চিচিঙ্গা , ঝিঙ্গা, করলা, শসা, জিরা, শাপলা, পদ্ম, সূর্যমুখী, কামরাঙ্গা, তেঁতুল, জলপাই, পেয়ারা, কলা, লেবু, ফুল প্রভৃতি ও বনফুলে পর্যাপ্ত পোলেন ও পুস্পরস থাকায় মৌমাছির বংশ বৃদ্ধিতে সহায়তা পায়। মৌ-খামারীকে অবশ্যই প্রকৃতিতে মৌমাছির উপযোগী এ সব উৎসের কথা বিবেচনায় এনে মৌ-কলোনি স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
- **কলোনি স্থাপন-** মৌ-কলোনিকে (মৌমাছিসহ মৌ-বাক্স) স্ট্যান্ডের খুঁটির উপর স্থাপন করা উচিৎ যাতে বৃষ্টির ছিটানো পানি মৌ-বাক্সের ক্ষতি করতে না পারে। এ সময় রোদের তাপ এবং গরম আবহাওয়া বিরাজ করার কারণে কলোনিকে ছায়াযুক্ত স্থানে স্থাপন করতে হবে। কলোনির প্রবেশ পথ দিয়ে মৌমাছি বাহির হয়ে যেন সহজেই আসা যাওয়া করতে পারে এমন স্থানের ব্যবস্থা করা। যে স্থানটি দুর্গন্ধ, স্যাঁতস্যাতে, বিকট আওয়াজমুক্ত, গরু, ছাগল, মানুষ যেখান দিয়ে চলাচল করে না এমন স্থান হওয়া উচিৎ।
- **চাক ব্যবস্থাপনা-** মৌ-কলোনি থেকে কালো এবং পুরাতন চাক সরিয়ে ফেলে তা জ্বালিয়ে মোম তৈরি করে ফেলতে হবে। খালি ভালো চাক সংরক্ষণ করা যেতে পারে পরবর্তী বৃদ্ধিকালীন এবং মধু ঋতুতে ব্যবহার করার জন্য। মৌমাছির চাপ অনুযায়ী চাক রাখতে হবে। দুর্বল কলোনিতে ডিম, লারভা, পিউপাযুক্ত চাক দিয়ে সাপোর্ট দেয়া। লুণ্ঠনকারী মৌমাছি, ডিমরুল, পিঁপড়া, বোলতা, টিকটিকি, তেলাপোকা, পাখি এসবের হাত থেকে মৌমাছিদের রক্ষা করা। রোগাক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত ওষুধ ব্যবহার করা। এপিয়ারিতে রক্ষিত পানির পাত্রে সময় মতো ও প্রয়োজন মতো পরিষ্কার পানি দেয়া। মৌ-কলোনি নিয়মিত পরিদর্শন করে ফ্লোরবোর্ড, আশপাশ পরিষ্কার রাখা।
- **মৌমাছির স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা-** কলোনিতে মৌমাছির স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত প্রত্যেকটি কলোনিতে গড়ে ৪-৫ ফ্রেম মৌমাছি থাকা প্রয়োজন। কলোনি বৃদ্ধিকালীন সময়ে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাসে চাক সংখ্যা হবে গড়ে ৮-৯ ফ্রেম। যদি কলোনির রাণী মৌমাছি কম বয়সী হয় (নিউকুইন মিটেট) তাহলে রাণীর ডিম দেয়ার হার বেড়ে পর্যায় ক্রমিকভাবে কলোনিতে সব বয়সের মৌমাছির উপস্থিতি থাকবে এবং কলোনির অভ্যন্তরের রুটিন মাফিক কাজগুলো সম্পাদিত হবে।
- **কলোনিতে কৃত্রিম খাবার ব্যবহার-** কলোনিতে কৃত্রিম খাদ্য হিসেবে সপ্তাহে দুই দিন বা দুই দিন পরপর তরল খাদ্য (চিনি ও পানির মিশ্রন ৫০:৫০ অনুপাতে) এবং পোলেনের বিকল্প খাদ্য হিসেবে মুগ ডালের ব্যাসন দেয়া যায়। মুগ ডালের ব্যাসনের সাথে ভুট্টার ব্যাসন, কর্নফ্লাওয়ার, আইসিং সুগার ও হাফ ক্রিম মিল্ক পাউডার মিশিয়ে দেওয়া যায়। মৌমাছির রোগ প্রতিরোধ স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অক্সিটেট্রাসাইক্লিন এবং মাল্টিভিটামিন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যায়।

সাবধানতা

মৌ-কলোনি পরিদর্শনের সময় সতর্কতার সাথে চাকের অবস্থা (নতুন/পুরাতন), পুরুষ কুঠুরি, রাণী কুঠুরি, মৌমাছির খাবার (পোলেন/নেকটার), ব্রুড (ডিম, লার্ভা, পিউপা) রাণীর ডিম পাড়ার ধরন, রাণীর উপস্থিতি, রোগজীবাণু, ফ্লোরবোর্ড, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করা এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া।

- বৃষ্টির দিনে পরিদর্শন না করা;
- ঝড়ের সময় যাতে কলোনি ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে জন্য স্ট্যান্ডকে বাক্সের সাথে শক্ত করে বেধে রাখা;
- বৃষ্টির পানি যাতে বাক্সের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য উপরে ঢাকনার নিচে পলিথিন ব্যবহার করা;
- মৌমাছির শত্রু থেকে মৌমাছিকে নিরাপদ রাখা;
- কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মৌমাছিকে নিরাপদ রাখা;
- খাদ্য সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত ফিডারপটটি অবশ্যই ব্রুড চেম্বারে সর্বশেষ চাকের পাশে স্থাপন করা;
- কলোনিসমূহ নিরাপদ দূরত্বে স্থাপন করে সকল কলোনিতে এক সাথে খাবার দেয়া।

১.১০ সেশন পরিকল্পনা

রিলে ফসল নির্বাচন ও উৎপাদন কৌশল

বাংলাদেশের জলবায়ু নানা জাতের শস্য চাষের জন্য উপযোগী। এখানে সারা বছর তিনটি ভিন্ন মৌসুমে শস্যের আবাদ করা হয়। প্রতি মৌসুমে কৃষক তার ফসল বিন্যাসে যে সব ফসল অন্তর্ভুক্ত করেন তা এলাকাভিত্তিক মাটির গুণাগুণ, পানির প্রাপ্যতাসহ অনেক বিষয় বিবেচনায় এনে নির্বাচন করেন। রিলে ফসল নির্বাচনে যে সমস্ত বিষয়ে জোর দেওয়া হয় তা হলো ফসলের সন্নিবেশ, চাষ পদ্ধতি, শস্যের জাত এবং ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে চাষি তার সম্পদ, ফসল উৎপাদন মৌসুমগুলোর মধ্যে অধিকতর দক্ষতা ও ভারসাম্যতার সঙ্গে উপযোগী রিলে ফসল নির্বাচন করেন। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দৈনন্দিন তাপমাত্রার সাথে সংগতি রেখে রোপা আমনের সাথে রিলে ফসল হিসেবে খেসারি উৎপাদন করলে ফসল তাপমাত্রার কম বেশি মানিয়ে নিতে পারে এবং মাটির উর্বরা শক্তির সমন্বয় করে ভালো ফলন দেয়। আমন ধান কাটার ১০ থেকে ১২ দিন আগে খেসারির বীজ বপন করলে মাটিতে যে আর্দ্রতা থাকে তা পুরাপুরি কাজে লাগাতে পারে এবং পরে খরা দেখা দিলেও খেসারি উৎপাদনে এর প্রভাব পড়ে না। তাই রোপা আমনের সাথে রিলে ফসল হিসেবে খেসারির চাষ একদিকে যেমন ফলন বাড়ায় তেমনি খাদ্য নিরাপত্তায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

সেশনের উদ্দেশ্য

- রিলে ফসল চাষ কি তা জানতে পারবে;
- প্রশিক্ষণার্থীরা উপযোগী রিলে ফসল নির্বাচন ও উৎপাদন কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবে।

সময়ঃ ৬০ মিনিট

উপকরণঃ লিফলেট, ছবি, পোস্টার, মার্কার কলম, ব্রাউন পেপার, হোয়াইট বোর্ড, পেপার ক্লিপ, ফ্লিপচার্ট, পেপার টেপ, হোয়াইট বোর্ড মার্কার।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে সেশন শুরু করা;
- রিলে ফসল কেন চাষ করা হয় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া;
- এ সেশনটি নেয়ার প্রয়োজনীয়তা ও এ সেশনে তাদের কি উপকার হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া;
- প্রশিক্ষণার্থীরা রিলে/সাথী ফসল হিসাবে কি কি ফসল করেন তা জানতে চাওয়া;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত আবহাওয়ায় রিলে ফসল চাষে ফসল নির্বাচনে সহায়তা করা।

সেশন সহায়ক প্রশ্নাবলী

০১. রিলে ফসল কি মাটির গুণাগুণ উন্নত করে?
০২. রিলে ফসল নির্বাচনের উৎপাদন কৌশল কি হওয়া উচিৎ?
০৩. রিলে ফসলের সম্ভাব্য বাধাগুলো কি কি?

১.১০ সেশন সহায়ক নোট

রিলে ফসল নির্বাচন ও উৎপাদন কৌশল

কিছু কিছু ফসল, যেগুলো ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পাকে, যাদের দৈহিক বৃদ্ধির প্রকৃতিও ভিন্ন, এক সাথে বপন করলে মাটির বিভিন্ন স্তর থেকে খাদ্য উপাদান আহরণ করে এবং কার্যকরভাবে সৌরশক্তি গ্রহণ করে, সেগুলো রিলে ফসল হিসাবে চাষ করা যায়। রিলে ফসল চাষে পোকা-মাকড়, রোগ বালাই এবং আবহাওয়াজনিত ঝুঁকিসমূহ কমে যায়। লবণাক্ততা, খরা ও বন্যা প্রবণ এলাকায় আখ চাষের প্রাথমিক পর্যায়ে রিলে ফসল হিসেবে আলু, ডাল এবং তৈলবীজ জাতীয় শস্যের চাষ অত্যন্ত সফল প্রমাণিত হয়েছে এবং এসব ফসলের মোট ফলন একক ফসলের ফলনের চেয়ে অধিক হয়। রিলে ফসল চাষের মাধ্যমে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, সেচের সীমাবদ্ধতা ও শ্রম ঘাটতি বাঁচানো সম্ভব হয়।

রোপা আমনের সাথে খেসারি/মাসকলাইয়ের রিলে চাষ

বন্যা, খরা ও লবণাক্ত এলাকায় রোপা আমন ধান কাটার পর খেসারি বপনের উপযুক্ত সময় ও বীজ গজানোর জন্য জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকে না। তাই সঠিক সময়ে খেসারি বপন ও বৃষ্টি পরবর্তী মাটির অবশিষ্ট রস ব্যবহার করে রোপা আমনের সাথে খেসারির রিলে চাষ একটি উপযুক্ত কৌশল।

- রোপা আমন কাটার ৮-১২ দিন আগে জমিতে দাঁড়ানো ধানের ক্ষেতে নরম ভেজা মাটিতে হেক্টর প্রতি ১৫ কেজি খেসারি/মাসকলাইয়ের বীজ ছিটিয়ে বুনতে হবে।
- বীজ বপনের ৪-৫ দিন আগে হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া, ৭৫ কেজি টিএসপি, ৪০ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ধান কাটার ৪-৫ দিন পর আগাছা পরিষ্কার এবং চারার পাতলাকরণ সম্পন্ন করতে হবে। এভাবে বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা উভয় এলাকাতে রোপা আমনের সাথে সরিষার রিলে চাষ করা যায়।

১.১১ সেশন পরিকল্পনা

জৈব কৃষি

প্রাকৃতিক উপায়ে জৈব উপকরণ ব্যবহার করে যে কৃষি করা হয় তাকে জৈব কৃষি বলে। এটি পরিবেশবান্ধব উপাদান পদ্ধতি যা পরিবেশ দূষণ কমাতে সাহায্য করে। এটি ফসলের গুণগতমান বৃদ্ধি করে। এতে জৈববর্জ্য পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা রক্ষা করা হয়। জৈব কৃষিতে কম্পোস্ট, ফসলের অবশিষ্টাংশ, সবুজ সার, ফসল পর্যায়ক্রম, সুষম সারের ব্যবহার এবং কৃত্রিম সার ও কীটনাশক বর্জন করা হয়।

সেশনের উদ্দেশ্য

সেশন পরিচালনা শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ জানতে সমর্থ হবেন-

- লাগসই কৃষি উন্নয়নের জন্য জৈব কৃষির প্রয়োজনীয়তা;
- জৈব কৃষির মূলনীতি।

সময়ঃ ৬০ মিনিট

উপকরণঃ ম্যানিলা পেপার, হোয়াইট বোর্ড মার্কার, পেপার টেপ, জৈব নমুনা, কোদাল, মিটার স্কেল ইত্যাদি।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে সেশন শুরু করে এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা;
- প্রশিক্ষণার্থীদেরকে জৈব কৃষি সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার তা জানানো;
- জৈব কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা;
- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করবেন এবং সম্ভাব্য উত্তর হ্যান্ডআউট থেকে দিবেন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন শেষ করবেন এবং পরবর্তী সেশন সম্পর্কে অবহিত করবেন।

সেশন সহায়ক প্রশ্নাবলী

০১. বাংলাদেশে এর ব্যাপক বিস্তার সম্ভব কি?

০২. জৈব কৃষি ও সনাতন কৃষির মধ্যে মূল পার্থক্য কি?

০৩. জৈব কৃষির সীমাবদ্ধতাগুলো কি কি?

১.১১ সেশন সহায়ক নোট

জৈব কৃষি

জৈব কৃষি এক প্রকার কৃষি ব্যবস্থা যেখানে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার না করে জৈব পদার্থের পুনঃচক্রায়ন যেমন-কম্পোস্ট ও শস্যের অবশিষ্টাংশ, ফসল আবর্তন ও সঠিক কর্ষণের মাধ্যমে মাটি ও ফসলের উত্তম অবস্থা বজায় রেখে সুস্থ সবল ফসল উৎপাদন করা যায়। জৈব কৃষিতে মাটিতে প্রয়োজনমত জৈব সার ব্যবহার করা হয়।

জৈব কৃষির প্রয়োজনীয়তা

- মাটির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা ঠিক রাখা;
- রাসায়নিক বালাইনাশক থেকে মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমানো;
- পরিবেশকে সংরক্ষণ করে পরবর্তী বংশধরদের জন্য উপযোগী রাখা;
- রাসায়নিক বালাইনাশক দ্বারা পরিবেশ দূষিত হওয়া রোধ করা;
- পৃথিবীর বুকে নিরাপদ জীবনযাপন (মানুষ, পশু-পাখি, জলজ প্রাণি), পরিবেশ সংরক্ষণ ও মাটির গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য জৈব কৃষি ব্যবস্থার প্রয়োজন;
- মাটিস্থ উপকারী জীব ও জীবাণুকে রক্ষা করা।

জৈব কৃষির মূলনীতি

- উদ্ভিদ পুষ্টির পুনঃচক্রায়ন;
- উর্বর মাটি তৈরি;
- প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ;
- বালাই ব্যবস্থাপনায় পরিবেশবান্ধব পদ্ধতির ব্যবহার;
- ব্যাপকহারে পশুসম্পদ উৎপাদন ও উন্নয়ন।

জৈব কৃষি পদ্ধতি

জৈব কৃষিতে বিভিন্ন ব্যবস্থা অনুসরণ করে ফসল উৎপাদনের প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থ, খাদ্য উৎপাদন ও পানি ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। বংশানুগতভাবে সমন্বিত হয় এমন গাছপালা ফসল নির্বাচন করা হয়ে থাকে। এ ধরনের কিছু পদ্ধতি হলো: সারিবদ্ধ ফসল, মিশ্র/আন্তঃফসল, আচ্ছাদন ফসল, সবুজ সার, মালচিং ও ধান ফসলের মুড়ি বড় রেখে ধান কাটা।

জৈব বর্জ্যের ব্যবহার

জৈব কৃষি ব্যবস্থা মাটির উর্বরতা রক্ষা ও খাদ্যোপাদান সরবরাহের জন্য জৈব বর্জ্যের পুনঃচক্রায়নের ওপর নির্ভরশীল। আর গাছপালা থেকে প্রাপ্ত কীটনাশক দিয়ে রক্ষা করা হয় ফসল। কিছু ওষুধি গাছ ব্যবহার করা হয়। এতে বুঝা যায় যে, কৃষিজ উৎপাদনের জন্য জৈব কৃষির সাফল্য নির্ভর করছে জৈব বর্জ্যের ব্যবহারে দক্ষতার ওপর। এটি একাধারে পরিবেশ, মানুষের স্বাস্থ্য ও জৈব পরিবেশ সংরক্ষণ করতে সক্ষম।

১.১২ সেশন পরিকল্পনা

ভেষজ বালাইনাশক ব্যবহারে পোকা ব্যবস্থাপনা

প্রকৃতিতে এমন অনেক গাছগাছড়া আছে যাদের রয়েছে আশ্চর্যজনক পতঙ্গবিরোধী বিভিন্ন গুণ। রাসায়নিক কীটনাশক প্রচলনের পূর্বে এসব গাছ গাছড়ার রস বা বিভিন্ন দ্রব্য দিয়ে ফসলের ক্ষতিকর কীট দমন করা হতো। পরিবেশবান্ধব এসব ভেষজ বালাইনাশক ব্যবহারে ক্ষতিকর পোকা ব্যবস্থাপনা সম্ভব।

সেশনের উদ্দেশ্য

- সেশন শেষে কৃষকগণ ভেষজ বালাইনাশক সম্বন্ধে ধারণা পাবেন;
- পতঙ্গবিরোধী গুণসম্পন্ন বিভিন্ন উদ্ভিদ চিনতে পারবেন;

- সিনেমা সংক্রান্ত কাগজপত্র ও ফাইল, ব্যক্তিগত ডায়েরি
- প্রশংসাপত্র/সার্টিফিকেট বা পুরস্কারের কিছু নমুনা

সময় ও স্থান

শিক্ষার্থীরা তাদের সুবিধামতো দিন নির্বাচন করবে, সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট/শিক্ষার্থী।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- প্রজেক্টর, স্ক্রিন, ল্যাপটপ/ট্যাব, স্পিকার, ইন্টারনেট সংযোগ
- প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার ট্রে (ফাঁকা সার্টিফিকেট ও ট্রফি)
- প্রশংসাপত্রে লেখার জন্য কলম, মার্কার
- প্রশংসাপত্রে সই করার জন্য ছোট টেবিল ও চেয়ার
- প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার বিতরণের ফটো তোলার ব্যবস্থা
- প্রশংসাপত্র বিতরণের সময় ব্যবহারের জন্য ব্যান্ডমাস্টার ও ব্যান্ড দল

প্রশংসাপত্রের ক্যাটাগরি

ক. প্রশংসাপত্রের সংখ্যা ও ক্যাটাগরি: সংখ্যা শিক্ষার্থীর সংখ্যার সমান

খ. প্রশংসাপত্রের ক্যাটাগরি: ক্যাটাগরির নাম শিক্ষার্থীর সংখ্যার উপর নির্ভর করবে

১.৩. প্রশংসাপত্র বিতরণ

প্রশংসাপত্র বিতরণের ক্যাটাগরি ও শিক্ষার্থী নির্বাচন

এই অনুচ্ছেদে প্রশংসাপত্র বিতরণের ক্যাটাগরি নির্বাচন করা হবে, যেমন- সেরা শিক্ষার্থী, সেরা উপস্থিতি, সেরা শিক্ষার্থী, সেরা উপস্থিতি, সেরা শিক্ষার্থী, সেরা উপস্থিতি,

উদ্ভিদজাত বালাইনাশকের অসুবিধা

- দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায় না;
- আয়তনে বেশি হওয়ায় স্থানান্তর ও ব্যবহার অসুবিধা;
- ব্যাপকভিত্তিতে ব্যবহার করা অসুবিধাজনক;
- কার্যকারিতা ধীর গতি সম্পন্ন;
- কোনো বাণিজ্যিক উৎপাদন এখনো এ দেশে শুরু হয়নি বলে যে-কোনো সময় হাতের কাছে পাওয়া যায় না।

কি কি পোকা ব্যবস্থাপনায় কার্যকর

ছোলার পড ছিদ্রকারী পোকা, লেদা পোকা, বিছা পোকা, ডায়মন্ডব্যাক মথ, প্রজাপতি পড বোরারের কীড়া ব্যবস্থাপনায় বিশেষ কার্যকর। তাছাড়া পাতাফড়িং, গাছফড়িং, পাতা সুড়ঙ্গ পোকা পূর্ণাঙ্গ বিটল, জাব পোকা, সাদা মাছি ও বাগ দমনে কার্যকর।

ভেষজ বালাইনাশকের কার্যপদ্ধতি

- ডিম, কীড়া অথবা পিউপা গঠনে বাধা দেয়;
- নিম্ফ অথবা কীড়ার খোলস বদলানো তথা রূপান্তর প্রক্রিয়ায় ঘটায়;
- যৌনক্রিয়া এবং মিলনে বাধা দেয়;
- পাকস্থলী প্রাচীরের সংকোচন ও প্রসারণ বন্ধ করে দেয় ফলে পোকার খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়;
- পোকার দেহের কাইটিন গঠনে বাধা দেয়;
- কীড়া এবং পূর্ণ বয়স্ক পোকা বিতাড়িত করে।

ভেষজ বালাইনাশক তৈরি ও ব্যবহারের পদ্ধতি

১. **নিমের পাতা ও ছাল:** ২ কেজি নিমের পাতা, ১.৫ কেজি নিমের ছাল শিলপাটায় থেতলে নিতে হবে। থেতলানো পাতা, ছাল এবং ৫০ গ্রাম গুঁড়া সাবান একটি পাত্রে নিয়ে ৫ লিটার পানি মিশাতে হবে। জ্বাল দিয়ে ৫ লিটার পানিকে কমিয়ে ১ লিটার বানিয়ে ঠাণ্ডা করে ছাঁকার পর ব্যবহার করা যাবে। এ মিশ্রণে ৯লিটার পানি যোগ করে স্প্রে করতে হবে।

কার্যকারিতা: সকল প্রকার মাছি পোকা, বিটল জাতীয় পোকা, কীড়া ও বিছা পোকা দমন করা যায়।

২. **নিম ছাল/বাকল:** নিম গাছের ছাল/বাকল ২৫০ গ্রাম থেতলিয়ে ৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে তা অল্প আগুনে গরম করতে হবে। পানি ফুটলে ৫০ গ্রাম সাধারণ কাপড় কাঁচা সাবান, ১০ গ্রাম তুঁতে ও ৫ গ্রাম সোহাগা পর্যায়ক্রমে ফুটন্ত মিশ্রণে মিশাতে হবে। এরপর ঠাণ্ডা করে ছেকে নিয়ে ৫ গুণ পানির সাথে মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করতে হবে এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

কার্যকারিতা: পাতার যে-কোনো পোকা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনে বিশেষ কার্যকর।

৩. **নিম পাতার গুঁড়া:** নিমপাতা ছায়ায় বিছিয়ে দুয়েক সপ্তাহ শুকাতে হবে। শুকনা পাতা ভালো করে গুঁড়া করতে হবে। প্রতি ৫০ কেজি বীজ সংরক্ষণের জন্য ১ কেজি গুঁড়া মিশাতে হবে। সংরক্ষণের মেয়াদ বাড়াতে হলে সমপরিমাণ ধুতরা পাতার গুঁড়া একই রকম মিশাতে হবে।

কার্যকারিতা: গুদামজাত ফসলের পোকা ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারযোগ্য।

৪. **নিমবীজ দ্বারা:** হালকা সবুজ বা হলুদাভ ১ কেজি নিমবীজ ধুয়ে ছায়ায় শুকিয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে তা পিষে মলমের মতো তৈরি করতে হবে। এর সাথে ৭৫ গ্রাম গুঁড়া সাবান মিশিয়ে ১ শত লিটার পানি মিশালে ১% দ্রবণ তৈরি করে সারা রাত ঢেকে রাখতে হবে। এর পর ৭০-৮০° সে: তাপমাত্রায় ২/৩ ঘন্টা ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ছেকে জমিতে ব্যবহার করা যাবে।

কার্যকারিতা: এটি বিটল জাতীয় পোকা, কীড়া এবং বিছা পোকা ও ক্ষেত্রে কার্যকরী।

৫. **তামাক পাতা:** এক কেজি কাঁচা তামাক পাতা ১০ লিটার পানিতে সারারাত ভিজিয়ে রেখে কচলিয়ে নিতে হবে অথবা বড় আকারের ১০টি শুকনা পাতা ১০ লিটার পানিতে সারারাত ভিজিয়ে রেখে কচলিয়ে নিতে হবে। তারপর ছেঁকে ব্যবহার করা যাবে।

কার্যকারিতা: বিটল, এফিড, জ্যাসিড ব্যবস্থাপনায় কার্যকর।

৬. **ইপিল-ইপিল পাতা ও জবা ফুলের পাতা:** এক (১) কেজি পরিষ্কার ইপিল-ইপিল পাতা সংগ্রহ করে চূর্ণ করতে হবে। পাতার রস সহজে বের করার জন্য প্রয়োজনে সামান্য পানি মেশানো যেতে পারে। পাতার চূর্ণ একটি কাপড়ে নিয়ে চিপে রস সংগ্রহ করে এর সঙ্গে ৩ লিটার

পানি মিশাতে হবে। পানি মেশানো রস ১ কাপ জবা পাতার রসের সঙ্গে মিশিয়ে (ইপিল-ইপিল পাতার রস সংগ্রহের মতো জবা পাতার রস সংগ্রহ করতে হবে) এ মিশ্রণ জমিতে স্প্রে করা যাবে।

কার্যকারিতা: ঝলসে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া, পাতায় দাগ লাগা, গাছে কালো দাগ রোগে কার্যকরী।

৭. **গাঁদা ফুলের শিকড়:** পরিষ্কার শিকড় ১ কেজি সংগ্রহ করে টুকরো টুকরো করে কাটতে হবে। চূর্ণ যন্ত্র দিয়ে এ শিকড় চূর্ণ করার সময় সামান্য পানি মেশান যেতে পারে যাতে শিকড়ের রস সহজে বের হয়। একটি কাপড়ে চিপে রস বের করে তা ১ লিটার পানি মিশাতে হবে। এ রস মেশানো পানি জমির মাটিতে সরাসরি স্প্রে (বীজ বপনের আগে জমিতে স্প্রে করা ভালো) করার উপযোগী।

কার্যকারিতা: শিকড়ের গিট উৎপাদনকারী নিমাটোড বা কৃমি।

৮. **বিষকাটালি ও ঢোল কলমি:** বিষকাটালী বা ঢোলকলমির পেষানো পাতা কাণ্ড ১ কেজি, ১০ লিটার পানিতে ভিজিয়ে ছেঁকে নিয়ে স্প্রে করতে হবে।

কার্যকারিতা: এফিড, মাছি, পাতা ও ফলখেকো কীড়ার জন্য কার্যকরী।

৯. **টমাটো গাছ:** এক কেজি কাণ্ড ও পাতা ৫লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫-২০ মিনিট জ্বাল দিয়ে ছেঁকে নিয়ে স্প্রে করা যায়।

কার্যকারিতা: কাণ্ড ও পাতার শোষক পোকা, লার্ভা।

১০. **কালোকচুর পাতা ও ডগা:** এক কেজি কালোকচুর পাতা ও কাণ্ড ৫ লিটার পানিতে ৩০ মিনিট সেদ্ধ করে ঠাণ্ডা করার পর ছাঁকলে ব্যবহার উপযোগী হয়।

কার্যকারিতা: কীড়া, বাদামী গাছ ফড়িং পাতা শোষক পোকা।

১১. **আতা ও শরিফার পাতা:** পেষানো বা বাটা ১ কেজি পাতা ১০ লিটার পানিতে গুলিয়ে ছেঁকে নিয়ে স্প্রে করা যায়।

কার্যকারিতা: ডায়মন্ড ব্যাকমথ জাব পোকা, জ্যাসিড।

১২. **শুকনা মরিচের গুঁড়া:** শুকনা মরিচের গুঁড়া ১০০ গ্রাম ১ লিটার পানিতে সারারাত ভিজিয়ে রেখে পরে ৫০ গ্রাম গুঁড়া সাবান মিশিয়ে ৫ লিটার পানি যোগ করে এবং ছেঁকে নিয়ে স্প্রে করতে হবে।

কার্যকারিতা: মোজাইক ভাইরাস রোগের বাহক পোকা, পিঁপড়া, জাবপোকা ব্যবস্থাপনায় কার্যকর।

১৩. **পাটের বীজ:** পাটের বীজ ১ কেজি আস্তে আস্তে কড়াইয়ে ভেজে পিষে নিয়ে ৬০ লিটার পানিতে ভিজিয়ে কয়েক ঘন্টা পর ছেঁকে নিয়ে স্প্রে করতে হবে।

কার্যকারিতা: মাজরা, কীড়া, পাতা শোষক পোকা ।

১৪. **রসুনের রস:** সামান্য পানিসহ রসুন পিষে রসুনের রস দ্বারা সবজি বীজ মাখিয়ে বীজতলায় বপন করতে হবে।

কার্যকারিতা: বীজ শোধনের জন্য কার্যকরী বীজবাহিত ও মাটির অনেক রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ধ্বংস হয়।

১.১৩ সেশন পরিকল্পনা

মাটি পরীক্ষার গুরুত্ব, মাটির নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি এবং সার সুপারিশমালা প্রণয়ন

দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশে মাটিতে অপরিমিত সার ব্যবহারের জন্য মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হচ্ছে। কোন্ মাটিতে কোন্ পুষ্টি উপাদান আছে, কোন্‌টি ঘাটতি কোন্‌টি বেশি আছে তা জানা দরকার। এ ছাড়া আমাদের দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা যায়। কোন্ ফসলের কোন্ কোন্ উপাদানের বিশেষ চাহিদা আছে তা জানা দরকার। ফসলের চাহিদা ও মাটির পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ না জেনে সার ব্যবহার করলে ফসল ও মাটির ওপর যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে মাটির যাবতীয় গুণাবলী সম্পর্কে জানা যায়। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে স্থানভিত্তিক সুষম সার সঠিক সময়ে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে উৎপাদন অনেকটা বাড়ানো সম্ভব। তাই মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা সুন্দর পরিবেশ ও কৃষিকের উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য মাটি পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাটির নমুনা যেনতেনভাবে সংগ্রহ করলে পরীক্ষার মান ঠিক হবে না। মাটি সংগ্রহের বিজ্ঞানভিত্তিক নিয়ম রয়েছে। সেটা মেনেই মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।

সেশনের উদ্দেশ্য

সেশন থেকে প্রশিক্ষণার্থীগণ জানতে পারবে-

- মাটি পরীক্ষার গুরুত্ব;
- মাটির নমুনা সংগ্রহ করার নিয়ম-কানুন;
- সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ করার সুপারিশ;
- কোন কোন এলাকার মাটিতে কি কি পুষ্টি উপাদান থাকে;
- সারের কার্যকারিতা বাড়ানোর কৌশল।

সময়: ৬০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ব্রাউন পেপার, মাসকিং টেপ, মার্কার। কোদাল/খুরপি, বালতি, পলিথিন ব্যাগ এবং ট্যাগ।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশলাদি বিনিময়ের পর কেন এ সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- সেশনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা এবং এ সেশন থেকে কৃষকের কি ধরনের উপকার হবে তা বলা;
- কৃষকসহ মাঠে গিয়ে মাটির নমুনা ধাপে ধাপে সংগ্রহ ও পদ্ধতি প্রদর্শন করত: কৃষকদের দিয়ে সেগুলো অনুশীলন করানো;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা।

সেশন সহায়ক প্রশ্নাবলী

০১. সংগৃহীত নমুনা কিভাবে যথাকালে পরীক্ষার ফলাফল সঠিক পাওয়া যায়?
০২. জলাবদ্ধ জমিতে নমুনা সংগ্রহ করার সুযোগ আছে কি?
০৩. কত বছর পর পর মাটির পরীক্ষা করা প্রয়োজন?

১.১৩ সেশন সহায়ক নোট

মাটি পরীক্ষার গুরুত্ব, মাটির নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি এবং সার সুপারিশমালা প্রণয়ন

আমাদের দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা যায়। ফসলের চাহিদা ও মাটির পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ জেনে সার প্রয়োগ করা উচিত। মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে মাটির যাবতীয় গুণাবলী সম্পর্কে জানা যায়। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে স্থানভিত্তিক সুষম সার সঠিক সময়ে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে ফসল উৎপাদন অনেকটা বাড়ানো সম্ভব। তাই মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা, সুন্দর পরিবেশ ও কৃষকের উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য মাটি পরীক্ষা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি মাটির নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষার মাধ্যমে সার সুপারিশমালা প্রণয়ন করা ততধিক গুরুত্বপূর্ণ।

মাটি পরীক্ষার গুরুত্ব

মাটির স্বাস্থ্য ঠিক রেখে, দীর্ঘ সময় ধরে একই জমি থেকে অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে, নিয়মিত মাটি পরীক্ষা করানো প্রয়োজন। এর জন্য সঠিক স্থান থেকে সঠিকভাবে মাটির নমুনা সংগ্রহ করা দরকার।

মাটি পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ

০১. নমুনা সংগ্রহে মাঠের পরিস্থিতি অনুযায়ী সুবিধা মতো নিচের যে-কোনো একটি যন্ত্র ব্যবহার করুন (ছবি নং-১)

০২. যে জমির মাটি পরীক্ষা করাবেন সে জমির চারপাশ থেকে ৪-৫ হাত বাদ দিয়ে ২নং ছবি অনুযায়ী ১০-১২টি মাটির নমুনা সংগ্রহের জন্য স্থান নির্বাচন করুন। জমির পরিমাণ অনুযায়ী নমুনার সংখ্যা কম বেশি হতে পারে, তবে নমুনার সংখ্যা বেশি হলে, বিশ্লেষিত ফলাফল আরও ভালো হবে।

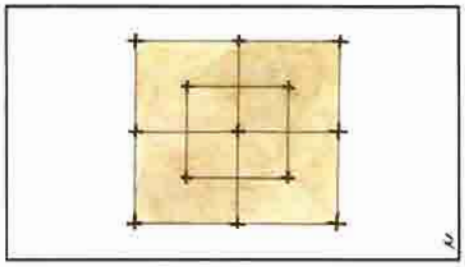

০৩. মাটির নমুনা সংগ্রহের আগে জমির এক স্থানে গর্ত করে লাঙ্গল চাষের গভীরতা দেখে নিয়ে সে গভীরতা থেকে নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।

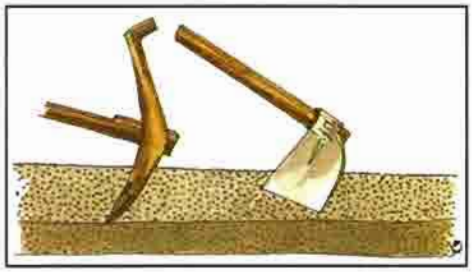

০৪. নমুনা সংগ্রহের জন্য কোদাল/বেলচা ব্যবহার করে 'V' আকৃতির একটি গর্ত করুন এবং গর্তের এক পাশ থেকে ৪ আঙ্গুল পরিমাণ (৭-৮ সেন্টিমিটার) পুরু একটি মাটির চাকা তুলুন।

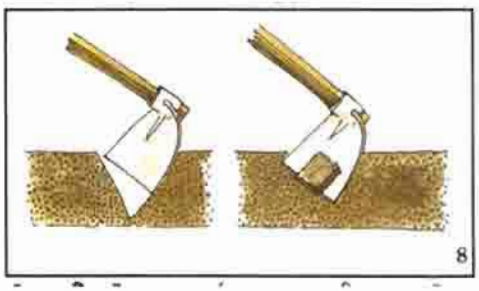

০৫. চাকাটির দু পাশ এবং কর্ষণ তলের অংশ (যদি থাকে) কেটে বাদ দিয়ে চাকাটি পলিথিন শিট বা প্লাস্টিকের বালতিতে রাখুন।

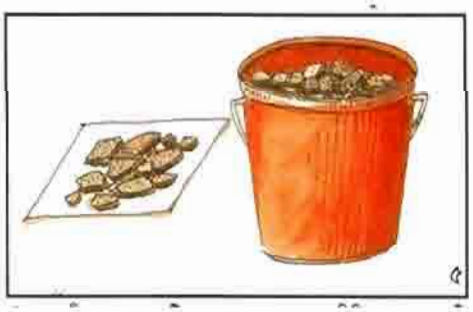

০৬. সংগৃহীত নমুনার মাটিগুলো একত্রে ভালোভাবে মিশ্রিত করুন। মাটি মিশ্রিত করার সময় ঘাস বা আগাছা থাকলে শিকড়সহ ফেলে দিন। এখন একটি জমির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মিশ্রিত নমুনা তৈরি হলো।

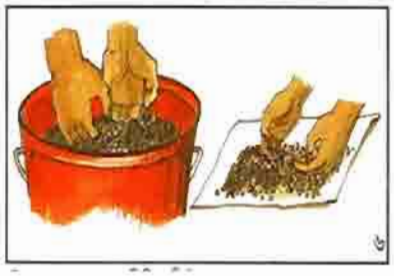

০৭. মেশানো নমুনা পলিথিন শিটে সমান ৪ ভাগ করে দু'কোণ থেকে দু'ভাগ ফেলে দিন। বাকি ২ ভাগ মাটি আবার মিশিয়ে আবার চার ভাগ করে পূর্বের মতো বিপরীত দু'কোণ থেকে দু'ভাগ ফেলে দিয়ে বাকি দু'ভাগ থেকে ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম পরিমাণ গুঁড়ো মাটি পলিথিন ব্যাগে রাখুন।

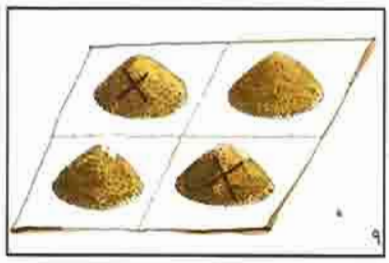

০৮. মাটি ভিজা ও ঢেলাযুক্ত থাকলে ছায়াযুক্ত স্থানে শুকিয়ে, কাঠের হাতুড়ি দিয়ে গুঁড়ো করে নিন।

০৯. এখন সংগৃহীত মাটি পরীক্ষার জন্য পলিব্যাগে লেবেল বা ট্যাগ লাগিয়ে সে ব্যাগটি রশি দিয়ে মুখ বন্ধ করুন পরে অন্য একটি পলিথিন ব্যাগে ভরে দ্বিতীয় ব্যাগের মুখ বন্ধ করুন এবং দ্বিতীয় ব্যাগের মুখে আর একটি ট্যাগ লাগিয়ে মাটি পরীক্ষার জন্য গবেষণাগারে পাঠিয়ে দিন।

১০. যে তথ্য সম্বলিত লেবেল বা ট্যাগটি পলিথিনের ব্যাগে লাগাবেন তার নমুনা নিচে দেয়া হলো।

মাটির নমুনা সংগ্রহ কার্ড

মাটির নমুনা সংখ্যা: মৃত্তিকা নমুনা নং
কৃষকের নাম:
জেলা: থানা: ব্লক: নমুনার গভীরতা:
ভূমি শ্রেণি:
মৃত্তিকা দল:
জমির পরিমাণ:
কি কি ফসল আবাদ করা হবে:
নমুনা সংগ্রহের তারিখ:
নমুনা সংগ্রহকারীর নাম, পদবি:

সার সুপারিশমালা

প্রথমত: নির্দিষ্ট কৃষি পরিবেশ অঞ্চল (এইজেড) টেবিল থেকে উদ্ভিদ পুষ্টির পূর্ণ চাহিদা স্থির করুন। দ্বিতীয়ত: অন্যান্য উৎস যেমন- খামারজাত সার, পোবরসার, সবুজসার ইত্যাদি থেকে কি পরিমাণ পুষ্টি পাওয়া যাবে তা নিরূপণ করুন। পরিশেষে আপনি প্রয়োজনীয় মোট পুষ্টি উপাদান থেকে, বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদান বাদ দিয়ে ফসলের জন্য সত্যিকারের চাহিদাকৃত পুষ্টি উপাদান বাহির থেকে প্রদেয় সারের মাত্রা পেতে পারেন। এরপর প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর) হিসাব করে বের করতে পারবেন (ইউরিয়া, ডিএপি, টিএসপি ইত্যাদি)। এভাবে তিনটি মৌসুমের জন্যই সারের হিসেব করে নিবেন। শস্য বিন্যাস অনুযায়ী সারের মাত্রা হিসেব করে বের করতে হবে। শস্য বিন্যাস ছাড়া সারের মাত্রা একটু ভিন্ন হবে। এক্ষেত্রে উপজেলা ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের ব্যবহার নির্দেশিকা ব্যবহার করা যেতে পারে।

১.১৪ সেশন পরিকল্পনা

ভালো বীজের গুণাবলী। বীজের অংকুরোদ্গম, পলিথিন আবৃত শুকনা বীজতলায় ধানের চারা উৎপাদন ও পরিচর্যা

ভালো বীজ সম্পর্কে ধারণা নিতে হলে বীজ কি তা জানা দরকার। সোজা কথায় একটি উদ্ভিদের যে অংশ বা অঙ্গ ব্যবহার করে পরবর্তীতে ঐ উদ্ভিদটি জন্মানো যায় সে অংশ বা অঙ্গকে ফসল ফলানোর জন্য বীজ বলা যায়। ফলন বৃদ্ধি এবং চাহিদা মোতাবেক উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য ভালো ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যা, আকস্মিক বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু বীজ ব্যবহারের বিকল্প কোনো উপায়ই নেই। ভালো ফসল ফলাতে হলে তাই ভালো দুর্যোগ সহিষ্ণু বীজ সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞান থাকতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে, মৌসুমকালীন দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনে এবং খাদ্য নিরাপত্তায় ভালো বীজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

সেশনের উদ্দেশ্য

এ সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ চাষের জন্য-

- বীজ কি জানতে পারবেন;
- ভালো বীজ জানতে এবং চিনতে পারবেন;
- ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য/গুণাবলী জানতে পারবেন;
- বীজ পরীক্ষা করার পদ্ধতি (অংকুরোদগম) জানতে পারবেন;
- আপদকালীন সময় চারা উৎপাদন পদ্ধতি ও চারার পরিচর্যা বিষয়ে জানতে পারবেন।

সময়: ৪৫ মিনিট

উপকরণ

বীজ বাছাই: নমুনা বীজ/কৃষকের ঘরে রাখা বীজ ৫০ গ্রাম (প্রতি ৫ জনের দল), সাদা কাগজের বোর্ড, মাপক নিক্তি, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, চিমটা, পেট্রিডিস/বাটি, ক্যালকুলেটর।

অংকুরোদগম পরীক্ষা: বাছাইকৃত ৪০০টি সুস্থ /ভালো বীজ, মাটির থালা, বালি (চিকন দানার), পানি।

চারা উৎপাদন ও পরিচর্যা: প্রদর্শন সামগ্রী (শুকনা পদ্ধতিতে বীজতলার ফ্লিপ চার্ট), পোস্টার পেপার, মার্কার, মাসকিং টেপ।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- তাদের কাছে কেন এ সেশনটি নিচ্ছেন এবং সেশনটি করলে তাদের কি উপকার হবে তা স্পষ্ট বলতে হবে;
- কুশল বিনিময়ের পর অংশগ্রহণকারীদের ৫ জন করে দলে বিভক্ত হয়ে গোলাকার করে বসতে হবে;
- প্রত্যেক দলে একটি করে সাদা কাগজের বোর্ড, নমুনা বীজ ৫০ গ্রাম, চিমটা, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, পেট্রিডিস/বাটি বিতরণ করতে হবে;
- নমুনা বীজে বিভিন্ন উপাদান ও চীটা, ভাঙ্গা, অপুষ্ট বীজ করে পৃথক পৃথকভাবে রাখতে বুঝিয়ে বলা। বাছাই করার সময় বীজ চেনা বা বীজ রোগাক্রান্ত কিনা তা জানার জন্য ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করা যেতে পারে;
- নমুনা বীজে কি কি উপাদান পেয়েছে তা অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রশ্ন করে জেনে বড় সাদা কাগজে পয়েন্ট আকারে লিখে নেয়া;
- অংশগ্রহণকারীদের কোন্‌টি ভালো বীজ তা নমুনা দেখিয়ে বলা।
- শুকনো বীজতলায় পলিথিনের নীছে চারা সাদা হয়ে যাবে কি?
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও অংকুরোদগম পরীক্ষা পরবর্তী পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা।

সেশন সহায়ক প্রশ্নাবলী

০১. হাইব্রিড বীজের বিশেষ কি গুণাবলী আছে?

০২. কৃষকের ঘরে সংরক্ষিত বীজ কি ভালো বীজ?

০৩. শতকরা কত ভাগ বীজ ভালো হলে ভালো বীজ বলা যাবে?

০৭. সকল ফসলের বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি কি একই রকম?

১.১৪ সেশন সহায়ক নোট

ভালো বীজের গুণাবলী। বীজের অংকুরোদগম, পলিথিন আবৃত শুকনা বীজতলায় ধানের চারা উৎপাদন ও পরিচর্যা

শস্য উৎপাদনে বীজের গুরুত্ব অপরিসীম। ফসল উৎপাদন ব্যয়ের খুব সামান্য অংশই ব্যয় হয় বীজের জন্য। অথচ ফসল ভেদে বীজ এককভাবে ফলন এবং উৎপন্ন পণ্যের গুণাগুণে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে আমাদের দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরা ইত্যাদি কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ জন্য পরিবর্তিত জলবায়ুতে খাপ খাওয়ানোর জন্য উন্নত জাতের ও উল্লেখিত দুর্যোগ সহনশীল বীজ প্রয়োজন, যার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করে দেশের চাহিদা পূরণ করা যাবে।

বীজের গুরুত্ব

- বীজ শস্য উৎপাদনের জন্য একটি অন্যতম মৌলিক উপকরণ হিসাবে কাজ করে;
- উন্নত বীজ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে;
- উন্নত জাতের বীজ উৎপাদিত শস্য উৎপাদনের ব্যয় পরোক্ষভাবে কমিয়ে দেয়;
- উন্নত জাতের বীজ উৎপাদিত ফসলের গুণাগুণ বহুগুণে বৃদ্ধি করে।

ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য

- ভালো বীজের জাত উন্নত হতে হবে;
- জাতের বিশুদ্ধতা থাকতে হবে;
- বীজ সুপরিপক্ক, পুষ্ট ও সব বীজ একই রঙ ও আকারের হবে;
- বীজে আগাছা বা অন্য জাতের বীজের মিশ্রণ থাকবে না। কমপক্ষে ৯৪% বিশুদ্ধ বীজ হতে হবে;
- বীজ চকচকে অর্থাৎ বীজের উজ্জ্বলতা বেশি হবে;
- বীজে পোকা ও রোগের আক্রমণ থাকবে না;
- বীজে পানির ভাগ বা আর্দ্রতা দানা ফসলের ক্ষেত্রে ১০ থেকে ১২ ভাগ এবং অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে ৬ থেকে ৯ ভাগ থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে বীজ দাঁত দিয়ে কাটলে কট করে শব্দ হবে;
- বীজের গজানোর ক্ষমতা বীজের প্রকারভেদে শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগের বেশি হবে।

ফসল চাষের জন্য আমরা বিভিন্ন নাম ও গুণাগুণ সম্বলিত বীজ ব্যবহার করে থাকি। ভালো ফলন পেতে হলে এ ধরনের বীজ সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা দরকার।

মৌল বা প্রজনন বীজ- উদ্ভিদ প্রজননের নিয়ম-কানুন পালন করে প্রজননকারী বিজ্ঞানী দীর্ঘ দিনের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কোনো প্রকার মিশ্রণ ছাড়াই যখন একটি শস্যের জাতকে খুব ভালো মনে করেন তখন সে শস্যের বীজকে প্রজনন বীজ বলা হয়। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীর তত্ত্বাবধানে উক্ত ফসলের প্রকৃত গুণাগুণ বজায় রেখে এ বীজ উৎপাদন করা হয়।

ভিত্তি বীজ- মৌল বীজ বা প্রজনন বীজ হতে উৎপন্ন বীজকে ভিত্তি বীজ বলা হয়। এ ধরনের বীজ উৎপাদনের সময়ও উদ্ভিদ প্রজননের সকল নিয়ম ও সতর্কতা পালন করা হয়। ফলে এ বীজের আদিগুণ ও বিশুদ্ধতা বজায় থাকে।

প্রত্যয়িত বীজ- প্রত্যয়িত বীজ মানে প্রত্যয়নপত্র বা সার্টিফিকেট দেয়া বীজ। বীজের মান পরীক্ষা করে সরকার এ সার্টিফিকেট দেয় যা বীজের প্যাকেটের গায়ে সেঁটে দেয়া থাকে। মনে করা হয় এ ধরনের সার্টিফিকেট দেয়া বীজ মানসম্পন্ন বীজ, অর্থাৎ বীজের জাত গজানোর ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা এসব গুণ পরীক্ষিত এবং নির্দিষ্ট মানসম্পন্ন।

উচ্চফলনশীল বীজ- চলতি কথায় উফশী বীজ অর্থাৎ উচ্চ এর 'উ', ফলনের 'ফ' এবং শীল এর 'শ' এ নিয়ে উফশী। এ কথা বলে বা বীজের প্যাকেটে লিখে বুঝানো হয় বীজের জাতটির ফলন উচ্চ অর্থাৎ বেশি। কিন্তু বীজের অন্যান্য গুণ যেমন- গজানোর ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা এসব সম্বন্ধে কোনো তথ্য বুঝায় না।

উন্নত বীজ- স্থানীয় জাত বা বন্য জাত, তার মধ্য থেকে বেছে ভালো গুণ সম্পন্ন জাত বের করে উন্নত জাত হিসেবে নাম দেয়া হয়। এ ধরনের জাতের বীজকে উন্নত জাতের বীজ বলা হয়। এ নাম থেকে বীজের জাত সম্বন্ধে তথ্য বুঝা গেলেও বীজের অন্যান্য গুণ সম্বন্ধে কোনো কিছু বুঝা যায় না।

আধুনিক বীজ- যে জাতটি সবচেয়ে পরে অথবা যে জাতগুলো সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে সেগুলো আধুনিক জাত। এসব সাম্প্রতিক জাতের বীজকে আধুনিক জাতের বীজ বলা হয়। এ নাম থেকে বীজের জাত সম্বন্ধে তথ্য বুঝা গেলেও বীজের অন্যান্য গুণ সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায় না।

হাইব্রিড বীজ- একই ফসলের এক জাতের পুরুষ ও অন্য জাতের স্ত্রী ফুলের মিলনে যে সব নতুন জাত পাওয়া যায় তার মধ্যে কোনো কোনোটি জাত উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত জাতের (স্ত্রী ও পুরুষ) গুণাবলী থেকেও উন্নত। এ ধরনের বীজকে হাইব্রিড বীজ বলা হয়। হাইব্রিড বীজ/জাত চাষাবাদ করে অধিক ফলন পাওয়া গেলেও তা থেকে পরবর্তী মৌসুমে চাষ করার জন্য বীজ রাখা যাবে না। প্রতি বছরই নতুন হাইব্রিড বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। হাইব্রিড বললেই ভালো হবে এমন কোনো কথা নেই। হাইব্রিড বীজের যদি গজানোর ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা নির্দিষ্ট মানের না হয় তাহলে কোনো মতেই হাইব্রিড বীজ ভালো বীজ নয়।

ভালো বীজের গুণাবলী

ভালো বীজ হতে হলে অবশ্যই নির্ধারিত মানসম্পন্ন হতে হবে। মানসম্পন্ন বীজ হতে হলে বীজের কি কি গুণ থাকতে হবে তা আলোচনা করা হলো।

জাতবিশুদ্ধতা- ফসলের জাতের বিশুদ্ধতা বলতে বীজের বংশগত বিশুদ্ধতা বোঝায়। প্রত্যেক জাতের নির্দিষ্ট কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে যার ওপরে ফলনের পরিমাণ ও মান নির্ভর করে। যদি কোনো ফসলের এক জাতের বীজের সাথে অন্য জাতের মিশ্রণ বা সংমিশ্রণ ঘটে তাহলে জাতের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়। বীজের এ একটি মাত্র গুণ যা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে নির্ণয় করা কঠিন। এজন্য সাধারণত পরীক্ষাগারে জাত বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা হয় না। মাঠে বীজ ফসল থাকার সময় অন্য জাতের গাছ থাকলে তা উপড়িয়ে ফেলে দিয়ে জাত বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে হয়।

বীজ বিশুদ্ধতা- বীজ বিশুদ্ধতা বলতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ধুলাবালিহীন, আগাছা বা অন্য ফসলের বীজমুক্ত এবং জড় পদার্থমুক্ত বীজকে বোঝায়। অর্থাৎ বিশুদ্ধ বীজে আগাছার বীজ কিংবা অন্য ফসলের বীজ এবং কোনো প্রকার ময়লা বা জড় পদার্থ থাকবে না। বীজ থেকে নমুনা নিয়ে তা ৩ ভাগ করা হয়। যথা- বিশুদ্ধবীজ, অন্য বীজ এবং জড় পদার্থ। নমুনার ওজনের শতকরা হারে বিশুদ্ধ বীজের পরিমাণ প্রকাশ করা হয়। সাধারণভাবে বীজ বিশুদ্ধতার হার শতকরা শত ভাগের কাছাকাছি হওয়া ভালো।

গজানোর ক্ষমতা- বীজ নমুনার শতকরা কয়টি বীজ গজায় সে হিসেব দ্বারা বীজের গজানোর ক্ষমতা প্রকাশ করা হয়। ভালো বীজের গজানোর ক্ষমতা শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু সাধারণত এমনটি ঘটে না। যদি কোনো নমুনায় কমপক্ষে বীজ বিশেষে শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ গজায় তবে সে বীজ ভালো বীজ হিসেবে গণ্য হয়। বীজের গজানোর ক্ষমতা প্রধানত নির্ভর করে তেজ, সুপ্ততা ও আর্দ্রতার ওপর।

বীজের আর্দ্রতা- বীজের মধ্যে শতকরা কত ভাগ পানি আছে তাই বীজের আর্দ্রতা। বীজের আর্দ্রতা যতবেশি হবে বীজের গজানোর ক্ষমতা ও তেজ তত দ্রুত কমে যাবে। ধান বা গমের বীজের বেলায় আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগ অন্যান্য বীজের বেলায় শতকরা ১০ ভাগের নিচে থাকলে বীজ মোটামুটি ভালো থাকে।

বীজের সুস্থতা- রোগমুক্ত এবং পোকায় না কাটা বীজকে সুস্থ বীজ বলে। বীজ ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত অনেক রোগ বহন করতে পারে। আবার গুদামে সংরক্ষণকালে সংরক্ষণ-ব্যবস্থা ভালো না থাকলে পোকা ও ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। রোগের জীবাণু বীজের ত্বকে বা ভেতরে থাকতে পারে। রোগাক্রান্ত ও পোকায় কাটা বীজ হতে চারা উৎপাদনের নিশ্চয়তা থাকে না।

বীজের আকার- সব বীজ আকারে এক সমান হয় না। অনেক ফসলেরই বড় আকারের বীজ হতে ভালো ফসল পাওয়া যায়। এজন্য বীজ পুষ্ট এবং বড় আকারের হলে বীজ ভালো হয়। আবার সব বীজ এক আকারের হওয়া দরকার যাতে মাঠে চারা সবই এক রকম হতে পারে। চালনি দিয়ে ছেঁকে ছোই বীজ ফেলে দিয়ে বীজ বড় এবং এক আকারের করা সম্ভব হয়।

বীজের তেজ- বীজের চারা যদি সতেজ ও স্বাস্থ্যবান হয় এবং প্রতিকূল অবস্থায়ও তাড়াতাড়ি বড় হয় তবে সে বীজকে তেজী বীজ বলা হয়। বীজ বপন থেকে শুরু করে ফসল কাটা পর্যন্ত বীজ, চারা ও গাছ নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। যে বীজের তেজ যত বেশি প্রতিকূল অবস্থায় সে বীজ ততটা সহিষ্ণু হতে পারে। গজানোর দ্রুততা বা চারার দৈর্ঘ্য মেপে বীজের তেজ নির্ণয় করা যায়।

বীজের সুপ্ততা- উপযুক্ত পরিবেশে কোনো সজীব বীজের অংকুরোদগম না হওয়াকেই বীজের সুপ্তাবস্থা বলে। প্রায় প্রত্যেকটি ফসলের বীজের নির্দিষ্ট সুপ্তিকাল আছে। বীজ উৎপাদনের পর নির্দিষ্ট সময় বীজ গজায় এবং সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। তা না হলে বিশেষ উপায়ে সুপ্তাবস্থা ভাংতে হয়। অবশ্য অনেক বীজ আছে যেগুলো উৎপাদনের পর পরই এমন কি গাছে থাকতে গজাতে পারে।

আর মানসম্পন্ন বীজ বললে আমরা বুঝবো বীজের কয়েকটি গুণ যথা জাত বিশুদ্ধতা, বীজবিশুদ্ধতা, গজানোর ক্ষমতা, আর্দ্রতা, সুস্থতা, আকার এবং তেজ নির্দিষ্ট মানসম্পন্ন। এসব গুণ বীজ মাঠ দেখে এবং পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে নির্ণয় করা যায়।

বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষা

এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো কোনো বীজের নমুনার শতকরা হার হিসেবে কয়টি বীজ গজাতে সক্ষম তা নিরূপণ করা। অংকুরোদগম ক্ষমতা সন্তোষজনক না হলে মাঠে বিশুদ্ধ বীজ বপন করেও আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না। তাই যে-কোনো ফসলের বীজ বপনের পূর্বে অংকুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করে নেয়া একান্ত প্রয়োজন। পরীক্ষার জন্য সংগৃহীত নমুনা থেকে বিশুদ্ধ বীজ নিয়ে অংকুরোদগম পাত্রে বসাতে হয়। সাধারণত বড় আকারের বীজ ৫০টি এবং ছোট আকারের বীজ ১০০টি করে পরীক্ষার জন্য বসানো হয়।

অংকুরোদগম পরীক্ষার কয়েকটি পদ্ধতি হলো- রেগডল পদ্ধতি, রুটিং পেপার পদ্ধতি, পেট্রিডিশ পদ্ধতি, কলা পাতা পদ্ধতি ইত্যাদি।

১) কাচের পেট্রিডিশে পরীক্ষা

বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষার জন্য কাচের পেট্রিডিশ খুবই উপযোগী। পাত্রের তলদেশে চোষ কাগজ বসিয়ে পরিমাণ মতো বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে। এবার চোষ কাগজের উপর নির্দিষ্ট সংখ্যক বীজ ফাঁক ফাঁক করে বসিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে পাত্রটিকে আলো বাতাসময় ছায়ামুক্ত স্থানে রাখতে হবে। একটি ছোট কাগজে বীজের নাম, বীজের সংখ্যা, পরীক্ষা বসানোর তারিখ ইত্যাদি লিখে পেট্রিডিশে আঠা দিয়ে লাগাতে হবে।

চোষ কাগজ শুকিয়ে গেলে মাঝে মাঝে পরিমাণমত পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। সাধারণত বীজ বসানোর ৩ দিন থেকে অংকুর গণনার কাজ শুরু হয় এবং ৭ দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। এভাবে প্রতিদিন অংকুরিত বীজ গণনার পর লেখলো ফেলে দেয়া হয়। একটি টিমটার সাহায্য নিলে গণনার কাজ সুবিধাজনক হয়। প্রতিদিন যে কয়টি অংকুরিত বীজ পাওয়া যাবে তা একটি ছকে লিখে রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক নমুনা থেকে দু'দফায় বীজ পরীক্ষা করা হলে ফলাফল ভুল হওয়ার আশংকা কম থাকে।

বীজ অংকুরোদগমে বসানোর তারিখ---------- বীজের সংখ্যা----------

চারার শ্রেণিভেদে	অংকুরিত বীজের সংখ্যা										মোট	গড় শতকরা হার (%)
	বীজ অংকুরিত হবার সময় (দিন)											
	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম		
স্বাভাবিক চারা												
মোট												
অস্বাভাবিক চারা												
মোট												
না গজানো বীজের সংখ্যা												

যে অংকুরিত বীজে ভবিষ্যৎ মূল ও কাণ্ড স্পষ্টভাবে স্বাভাবিক চারা গজাতে দেখা যায় সে বীজকেই বীজ হিসাবে গণ্য করা হয়, অন্যথায় তাকে অস্বাভাবিক চারা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

বীজের অংকুরোদগমকে শতকরা হারে (%) প্রকাশ করা হয়

$$\% \text{ অংকুরোদগম} = \frac{\text{অংকুরিত মোট বীজের সংখ্যা}}{\text{মোট বীজের সংখ্যা}} \times ১০০$$

পলিথিনে আবৃত শুকনা বীজতলায় বোরো ধানের চারা উৎপাদন প্রযুক্তি

(মানিকগঞ্জ মডেল)

সেচ ছাড়াই লবণাক্ততা এলাকায় মানিকগঞ্জ মডেলে বীজতলা তৈরি করার একটি সহজ পদ্ধতি। মানিকগঞ্জ মডেলে ধানের চারা উৎপাদনে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমানো সম্ভব। তাছাড়া, এ মডেলটি ব্যবহার করে একদিকে যেমন প্রায় ৫০% বীজ কমিয়ে আনা সম্ভব, অন্যদিকে উৎপাদন ব্যয় প্রায় ঠিক রেখে ফলন কমপক্ষে ২৫-৩০% বাড়ানো সম্ভব। বোরো মৌসুমের জন্য এ পদ্ধতিটি খুবই ফলপ্রসূ।

বীজ অংকুরিত করাঃ বিশ্বস্ত উৎস থেকে সংগ্রহ করা অথবা নিজের বাছাই করা বীজ প্রথমে ২৪ ঘণ্টা পরিষ্কার পানিতে ভিজানোর পর আরও ৪৮-৭২ ঘণ্টা জাগ দিয়ে রাখতে হবে। চটের একটি ভিজা বস্তা ঝাঁকা/বাঁশের টুকরীতে বিছিয়ে তার উপরে ভিজা বীজ রেখে তার উপর আর একটি চটের ভিজা বস্তা দিয়ে ঢেকে তার উপরে খড়/বিচালীর চাপ দিয়ে রাখতে হবে। অতিরিক্ত শীতের সময় রাত্রে ঘরে নিয়ে রাখাই ভালো এবং দিনে রোদে রেখে দিতে হবে। এ ভাবে ২-৩ দিন রেখে দিলে সবগুলো ধান এক সাথে অংকুরিত হবে।

বীজতলা প্রস্তুত: বেড তৈরির আগে জমি প্রয়োজনমতো চাষ/কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে নিতে হবে। বীজতলার বেডের প্রস্থ ১ মিটার এবং দৈর্ঘ্য ৫ মিটার হলে ভালো। তবে জমির আকারের ওপর নির্ভর করে বেডের দৈর্ঘ্য কম বা বেশি হতে পারে। বেডের চতুর্দিকে ২০ সেন্টিমিটার চওড়া নালা থাকবে। পলিথিন ঢেকে দেয়ার জন্য নালার চাকা মাটি পাশে জমা করে রাখতে হবে। বেডের উপরিভাগ সমতল করে নিতে হবে। প্রয়োজনীয় রসের অভাব থাকলে হালকা সেচ দিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

সার প্রয়োগ: উর্বর জমিতে শুকনা বীজতলা তৈরি করলে কোনো সারের প্রয়োজন হয় না। তবে কম উর্বর জমি হলে পরিমাণমত জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। এ পদ্ধতিতে বীজতলায় রাসায়নিক সার ব্যবহার না করাই ভালো।

বীজ বপন: প্রতি শতাংশে (১ মিটার x ৫ মিটার) মাপের ৮টি বেডের জন্য ৩.০০ থেকে ৩.২৫ কেজি বীজ প্রয়োজন। অংকুরিত বীজ হালকা করে বীজতলায় সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। পঁচা গোবর মিশ্রিত মাটি হালকাভাবে ছড়িয়ে দিয়ে বীজগুলো ঢেকে দিতে হবে।

পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেয়া: ফ্রেমসহ বেড পলিথিন দিয়ে পুরোপুরি ঢেকে দিয়ে ২ ইঞ্চি পুরু করে ঝুরঝুরা মাটি পলিথিনের কিনার দিয়ে চাপ দিতে হবে, যাতে বাতাসে পলিথিন উল্টে না যায়। এ অবস্থায় ৫-৭ দিনে সবগুলো বীজ একসাথে গজিয়ে উঠতে থাকবে। চারাগুলো সোজা হয়ে সহজেই বেড়ে উঠার জন্য পলিথিনের কিনারের মাটিগুলো সরিয়ে আলগা করে সামান্য উঁচু করে দিয়ে আবার পলিথিন চাপ দিয়ে রাখতে হবে। এভাবে একটানা ২০-২৫ দিন পর্যন্ত ঢেকে রাখলে ধানের চারাগুলো বেড়ে রোপণ উপযোগী হবে। সহজে সূর্যের আলো পৌঁছার জন্য পলিথিন পাতলা ও সাদা (কালো ব্যতীত) হওয়া উচিত এতে খরচও কম হয়।

সুবিধাসমূহ

- শুধু নিচু জমি, বর্ষার পানি অথবা সেচের পানির ওপর নির্ভর করতে হয় না;
- সুস্থ-সবল ও সম্পূর্ণ কোল্ড ইনজুরি মুক্ত চারা ২০-২৫ দিনে উৎপাদন সম্ভব;
- এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত চারা সুস্থ সবল হওয়ায় প্রতি গোছায় মাত্র একটি চারা রোপণ করেই ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব;
- পলিথিনে ঢেকে রাখার আর্দ্রতা সংরক্ষিত থাকে বলে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবেই বীজতলার সেচের প্রয়োজনীয়তা মিটে যায় এবং লবণ মোটেই জাগতে পারে না;
- শুকনা বীজতলায় উৎপাদিত চারা উত্তোলনে শ্রমিক খরচ প্রচলিত পদ্ধতির সিকি ভাগ;
- চারার শিকড় এলাকা খুবই মজবুত থাকে বিধায় মাটিতে চারা লেগে উঠতে কম সময় লাগে;
- প্রচলিত পদ্ধতির প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ মাত্র ১০ কেজি বীজ থেকে ৩-৩.৫ শতাংশের চারায় এক একর জমি (৩ বিঘা) রোপণ সম্ভব: শুকনা বীজতলার চারা রোপণে সর্বোচ্চ সংখ্যক কুশি পাওয়া যায় এবং যার অধিকাংশই কার্যকর কুশি;
- এ প্রযুক্তি ব্যবহারে সময় বাচে, খরচ কমে এবং সর্বোপরি প্রায় ২৫-৩০% ফলন বাড়ে।

সতর্কতা

- অতিরিক্ত শীতে কোনোক্রমেই পলিথিন সরানো যাবে না;
- বীজতলায় রসের অভাব হলে হালকা সেচের ব্যবস্থা করতে হবে;
- পলিথিনের নিচে অতিরিক্ত তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পলিথিন ২-৩ ঘন্টা সরিয়ে দিতে হবে;
- চারা শক্ত করার জন্য মূল জমিতে রোপণের ৩-৪ দিন আগে দৈনিক ২-৩ ঘন্টা পলিথিন তুলে দিতে হবে;
- বৃষ্টির পানি বা কুয়াশা পলিথিনের উপরে জমলে তা ফেলে দিতে হবে;
- নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

১.১৫ সেশন পরিকল্পনা

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় উন্নত চুলার গুরুত্ব, ব্যবহার ও স্থাপন পদ্ধতি

বাংলাদেশে প্রতি বছর রান্না ও অন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ৩৯ মিলিয়ন টনের বেশি প্রচলিত জ্বালানি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর পরিমাণ দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আবার বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায় ৫০% জ্বালানি কৃষির অবশিষ্টাংশ থেকে আসে। ফলে জমির জৈব পদার্থ কমে যাওয়ায় মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ও উর্বরতা শক্তি ক্রমেই কমে যাচ্ছে যা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট খরা প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে ঝুঁকি বাড়িয়েছে। রান্নার জন্য ব্যবহৃত সনাতন পদ্ধতির চুলা ব্যবহারে তাপের অপচয় বেশি হওয়ায় জ্বালানির অপচয়ও বেশি হয়। অথচ উন্নত চুলায় তাপের অপচয় কম হওয়ায় জ্বালানি কম লাগে এবং সেই সাথে কালো ধুঁয়া কম হয়। উন্নত চুলায় কৃষিজ জ্বালানি কম ব্যবহৃত হওয়ায় এক দিকে কৃষি ক্ষেত্রে যেমন মাটির উর্বরতা সংরক্ষণের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সৃষ্ট খরায় খাপ খাওয়ানো যায় আবার অন্য দিকে কালো ধুঁয়া কম হওয়ার কারণে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বাড়াতে কমাতে ভূমিকাও পালন হয়। ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় উন্নত চুলার গুরুত্ব অপরিসীম।

সেশনের উদ্দেশ্য

এ সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় উন্নত চুলার গুরুত্ব বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- উন্নত চুলার ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পাবেন;
- উন্নত চুলা স্থাপন করতে ও বর্ণনা করতে পাবেন।

সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

উপকরণ: প্রদর্শন সামগ্রী, পোস্টার পেপার, মার্কার, মাসকিং টেপ, ফ্লিপ চার্ট।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা ও কুশলাদি বিনিময় করে এ অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাসহ বুঝিয়ে দিবেন;
- তিনি সনাতন পদ্ধতির চুলা ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা জেনে প্রসঙ্গক্রমে গৃহস্থালীর রান্নার কাজে উন্নত চুলা ব্যবহারের বিষয় উত্থাপন করবেন এবং এ ধরনের চুলা সম্পর্কে কারো কোনো ধারণা থাকলে সে সম্পর্কে কিছু বলার আহ্বান জানাবেন এবং পাশাপাশি সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করবেন;
- অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে জেনে পোস্টার পেপারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ লিখুন। সহায়ক এ দু'ধরনের চুলার তুলনামূলক আলোচনা থেকে উন্নত চুলার গুরুত্ব অনুধাবণের চেষ্টা করাবেন;
- সহায়ক পূর্বে লিখিত ছক টানিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় উন্নত চুলার গুরুত্ব ও ব্যবহার সম্পর্কে উপস্থাপন করুন;
- তারপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কারো সনাতন/উন্নত চুলা তৈরির অভিজ্ঞতা থাকলে তা উপস্থাপন করার আহ্বান জানাবেন;
- অংশগ্রহণকারীদের ধারণা জানার পর সহায়ক উন্নত চুলার ছবি টাঙ্গিয়ে এ চুলার উপকরণ ও ডিজাইনের বিস্তারিত বিষয়ে উপস্থাপন করবেন এবং গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত উন্নত চুলা স্থাপনের বিস্তারিত বর্ণনা দিবেন। অংশগ্রহণকারীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তা ব্যাখ্যা সহকারে বুঝিয়ে দিবেন;
- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আশপাশে স্থাপিত উন্নত চুলা স্থাপন পদ্ধতি অংশগ্রহণকারীদের করে দেখাতে হবে;
- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কোনো মতামত থাকলে তা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ জানাবেন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন এবং পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে অবহিত করবেন।

সেশন সহায়ক প্রশ্নাবলী

০১. উন্নত চুলা কি, কত প্রকার ও কি, কি?
০২. উন্নত চুলায় কি কি উপকরণ লাগে?
০৩. উন্নত চুলার সুবিধা কি?
০৪. উন্নত চুলা তৈরির ধাপসমূহ কি কি?

১.১৫ সেশন সহায়ক নোট

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় উন্নত চুলার গুরুত্ব, ব্যবহার ও স্থাপন পদ্ধতি

দেশের খরাপ্রবণ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল জেলাসমূহে প্রায় ৯০% খড় ও গোবর গৃহস্থালীর জ্বালানি চাহিদা মিটানোর জন্য পোড়ানো হচ্ছে। ফলে মাটি জৈব পদার্থ ও অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। রান্নার জন্য ব্যবহৃত সনাতন পদ্ধতির চুলা ব্যবহারে তাপের অপচয় বেশি হওয়ায় জ্বালানির অপচয় বেশি হচ্ছে। উন্নত চুলা রান্না ও অন্যান্য তাপ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জৈব পদার্থের পরিমাণ কমিয়ে রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকর। উন্নত চুলা গৃহস্থালীর রান্না করা থেকে শুরু করে শিল্পে ব্যবহারের মতো অনেক কাজে কার্যকর হতে পারে। ফলে উন্নত চুলার ব্যবহার বাড়াতে পারলে যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো যাবে তেমনই পাশাপাশি কম জ্বালানি ব্যবহারের কারণে কম কালো ধুঁয়া নির্গমন হবে যা উষ্ণতা কমিয়ে সুযোগ ঝুঁকি কমাতে ভূমিকা রাখবে।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় উন্নত চুলার গুরুত্ব

- দ্রুত রান্না হয় ও খরচ কমে যায়;
- জ্বালানি কম লাগে;
- জ্বালানি কাঠের কম ব্যবহারের কারণে বন উজাড় কমবে;
- কৃষির অবশিষ্টাংশে যেমন- খড় ও গোবর-এর কম্পোস্ট জমিতে প্রয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে;
- কম পরিমাণে গ্রীনহাউস গ্যাস যেমন- কার্বন ডাই-অক্সাইড মুক্ত করে এ উন্নত চুলা জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে;
- উন্নত চুলা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনের সাথে সমান তালে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনেও কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

উন্নত চুলা তৈরি ও ব্যবহার

বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (BCSIR)-এর মডেল অনুসারে উন্নত চুলা তৈরির বর্ণনা দেওয়া হলো।

সিমেন্ট ও মাটি দিয়ে উন্নত চুলা তৈরি করা যায়। সিমেন্ট-এর তৈরি চুলা ফেটে যায় এবং এতে খরচ বেশি পড়ে। সুতরাং কৃষক পরিবার সিমেন্ট-এর পরিবর্তে মাটির তৈরি উন্নত চুলাই পছন্দ করে।

চুলা দুই ধরনের হয় যেমন- ১. চিমনি ছাড়া কার্যকর উন্নত চুলা ২. চিমনিসহ কার্যকর উন্নত চুলা। BCSIR-এর উদ্ভাবিত উন্নত চুলার মডেলগুলো হলো-

- একক মুখ বিশিষ্ট গৃহস্থালীর উন্নত চুলা যার অর্ধেক অংশ রডসহ ভূমির নিচে থাকে;
- একক মুখ বিশিষ্ট বাণিজ্যিক উন্নত চুলা যার অর্ধেক অংশ রডসহ ভূমির নিচে থাকে;
- দ্বি-মুখ বিশিষ্ট গৃহস্থালীর রান্নার উন্নত চুলা যার অর্ধেক অংশ ভূমির নিচে এবং সাথে চিমনি থাকে;
- ভূমির উপরে দ্বি-মুখ বিশিষ্ট বাণিজ্যিক রান্নার উন্নত চুলা যার সাথে চিমনি থাকে;
- বাণিজ্যিক রান্নার উন্নত চুলা যার সাথে চিমনি থাকে।

দ্বি-মুখ বিশিষ্ট গৃহস্থালীর রান্নার উন্নত চুলা ভূমির উপর চিমনিসহ তৈরি করা হয়। এই চুলার উপরের কাঠামো ভূমির উপর মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়। চুলার নিচের কাঠামোর তলদেশে উভয় পার্শ্বে দু'টি গর্ত থাকে যা বায়ু প্রবেশ এবং ছাই বের করার জন্য ব্যবহার করা হয়। গর্ত দু'টি লোহার চালুনি দিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত উপরের অংশে জ্বালানি রাখা হয় এবং জ্বালানি পুড়ে ছাই হলে তা চালুনির ভিতর দিয়ে নিচের অংশে জমা হয়। চালুনিটি চুলার উপরের সমতল হতে কোনো নির্দিষ্ট দূরত্বে (৬-৮ ইঞ্চি নিচে) স্থাপন করা হয়। আরসিসি পাইপের তৈরি একটি চিমনি একটি ক্যাপ লাগানো হয় যাতে বৃষ্টির পানি চুলায় প্রবেশ করতে না পারে। এ মডেলের উন্নত চুলা কাঠ, কয়লা খণ্ড, ও ডাল-পালা পোড়ানোর জন্য যথেষ্ট উপযোগী।

১.১৬ সেশন পরিকল্পনা

মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়নে সবুজ সারের গুরুত্ব

কোনো উদ্ভিদকে সবুজ অবস্থায় চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশানোর ফলে পঁচে যে সার তৈরি করা হয় তাই সবুজ সার। আমাদের দেশে সচরাচর শুঁটি জাতীয় গাছই সবুজ সার হিসেবে চাষ করা হয় এবং এর মধ্যে রয়েছে ধৈঞ্চা, শণ, বরবটি ইত্যাদি। দু'একটি চাষ ও মই দিয়ে এ সব গাছের ঘন করে বীজ বপন করে ৬-৮ সপ্তাহ পরে গাছ গুলো ১-১.৫ মিটার উঁচু হলে বা ফুল ফুটলে সবুজ সার তৈরির উপযুক্ত সময়। প্রথমে মই বা তক্তা দিয়ে গাছগুলো মাটিতে শুইয়ে দিতে হয়, মাটির সাথে তাড়াতাড়ি মিশে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনে সেচ দিতে হয় এবং গাছ বেশি লম্বা হলে কাঁচি দিয়ে ২ থেকে ৩ টুকরো করে নিলে চাষ দিতে সুবিধা হয়। পরিবর্তিত জলবায়ুতে খরা, লবণাক্ততা ও অতিরিক্ত পানির চাপের ফলে মাটির উর্বরা শক্তি ও গুণাগুণ দিনকে দিন নষ্ট হচ্ছে এবং মাটিতে শুঁটি জাতীয় গাছ চাষাবাদ করে সবুজ সার তৈরির মাধ্যমে মাটির সংযুক্তি, বুনট, গঠন এবং ক্ষয়রোধে সহায়তা পাওয়া যায়। বর্তমানে আমাদের দেশের চাষযোগ্য মাটির উর্বরতা খুবই সামান্য যার ফলে প্রতিনিয়ত মাটির সংযুক্তিতে এর প্রভাব পড়ছে। রাসায়নিক সার নির্ভর জমিতে সবুজ সার ব্যবহারে মাটির সংযুক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে জমিতে উর্বরতা আসবে এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় এ ধরনের সারের ব্যবহার রাসায়নিক সারের প্রয়োগ কমিয়ে দিবে এবং মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

সেশনের উদ্দেশ্য

সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ জানতে পারবেন-

- সবুজ সারের গুরুত্ব;
- সবুজ সার ফসলের নাম;
- সবুজ সার উৎপাদন ও ব্যবহার কৌশল।

সময়: ৬০ মিনিট

উপকরণ: স্কেল, মার্কার কলম, ব্রাউন পেপার, বোর্ড, পেপার ক্লিপ, ফ্লিপচার্ট ও মাসকিন টেপ।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পর কেন এ সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- এ সেশনটি নেয়ার প্রয়োজনীয়তা ও এ সেশনে তাদের কি উপকার হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়া;
- সবুজ সার ব্যবহারে মাটির গুণাগুণ এবং ফসলের ফলনের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধনের দিকসমূহ সম্পর্কে ধারণা দেয়া এ ক্ষেত্রে সবুজ সার তৈরির বিভিন্ন পোস্টার, লিফলেট, সহায়ক বই ব্যবহার করা;
- অংশগ্রহণকারীদের ৫টি গ্রুপে ভাগ করা এবং সমানভাবে মার্কার পেন, বড় ব্রাউন পেপারে তাদেরকে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে বলা;
- উপস্থাপনে পাওয়া তথ্যসমূহ থেকে সবুজ সারের গুরুত্ব প্রশিক্ষণার্থীদের পর্যালোচনা করতে বলা এবং এ সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে সহায়তা করা।
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা।

সেশনের সহায়ক প্রশ্নাবলী

০১. সবুজ সার ফসল কি সারা বছর চাষ করা যায়?
০২. লবণাক্ত মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় সবুজ সারের ভূমিকা আছে কি?
০৩. এ সারকে কেন সবুজ সার বলা হয়?

১.১৬ সেশন সহায়ক নোট

মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়নে সবুজ সারের গুরুত্ব

মাটির জৈব পদার্থের ক্ষয়পূরণের উদ্দেশ্যে স্বল্প মেয়াদি অল্প খরচে যে-কোনো মাটিতে শুঁটি জাতীয় গাছ জন্মিয়ে একই স্থানে ফুল ফোটার সময় গাছগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে সবুজ সার তৈরি করা হয়। সবুজ সার জাতীয় গাছের যেসব বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকা দরকার তাহলো-

- গাছ দ্রুত বর্ধনশীল হতে হবে যাতে অল্প সময়ের মধ্যে সবুজ সার প্রস্তুত করা যাবে;
- গাছের পাতা, কাণ্ড অন্যান্য অংশ অধিক নরম ও রসালো হতে হবে;
- অনুর্বর মাটিতেও গাছের শাখা প্রশাখা উৎপাদনের গুণ থাকতে হবে।

বাংলাদেশে সবুজ সার হিসেবে ব্যবহৃত হয় ধৈঞ্চা, শণ ও বরবটি। এসবের মধ্যে লবণাক্ততা, বন্যা, হঠাৎ বন্যা ও খরা এলাকায় সবুজ সার হিসাবে ধৈঞ্চা বহুল ব্যবহৃত হয়। সারা বছরই ধৈঞ্চা চাষ করা যায়, তবে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। দুই একটি চাষ ও মই দিয়ে ধৈঞ্চার বীজ ঘন করে বুনতে হয়। প্রতি হেক্টরে ৪০-৫০ কেজি বীজ ঘন করে ছিটিয়ে বুনতে হয়। বীজ বপনের দেড় মাসের মাথায় ফুল ফুটলে গাছগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়।

ফসল চাষে সবুজ সার হিসেবে ধৈঞ্চার অপরিসীম গুরুত্ব হলো:

- সবুজ পদার্থ মাটিতে মিশিয়ে দিলে নাইট্রোজেন ছাড়াও অন্য খাদ্য উপাদানগুলোও সরবরাহ করে, যা গাছের জন্য প্রয়োজনীয়;
- মাটির গঠন ও গুণাগুণ উন্নত করে। এতে বেলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ে ও মাটির অভ্যন্তরে বাতাস চলাচল বেড়ে যায়;
- সবুজ সার পচার সময় জীবাণুর কার্যকারিতা বাড়ে এবং গাছের গ্রহণ উপযোগী খাদ্য উপাদান অনেক সহজলভ্য হয়।
- সবুজ সার ব্যবহারের ফলে মাটির নিচের অংশটুকু গাছ সহজেই গ্রহণ করতে পারে এবং উপরের অংশে যেটুকু থাকে পরবর্তী ফসল তা সহজেই গ্রহণ করতে পারে;
- সবুজ সার জমির আর্দ্রতা ও ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জো অবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং মাটির অভ্যন্তরে বায়ু চলাচলে সহায়তা করে।

১.১৭ সেশন পরিকল্পনা

সার ও পানির মাধ্যমে বালাই ব্যবস্থাপনা

ফসলের বৃদ্ধি, পুষ্টি, ফলন ও গুণাগুণ বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহের উদ্দেশ্যে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয়। বর্তমান চাষাবাদ ব্যবস্থাপনার ফলে বাংলাদেশের মাটি থেকে বছরে প্রায় ১০ লাখ টন বিভিন্ন খাদ্যোপাদান অপসারিত হচ্ছে। এ ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। সারের অপরিলক্ষিত ব্যবহার পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাবসহ ফসল, পোকা-মাকড় ও রোগের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। ফসল উৎপাদনে পরিমিত পানি সালোকসংশ্লেষণ, প্রস্বেদন ও গাছের স্বাভাবিক বাড়াবাড়তিতে শর্করা পাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পানির স্বল্পতা বা আধিক্যে মাটি, ফসল, পোকা-মাকড় ও রোগ বালাই-এর ওপর বিভিন্ন প্রভাব রয়েছে

সেশনের উদ্দেশ্য

পাঠ শেষে শিক্ষার্থীগণ জানতে পারবেন-

- সারের সাথে পোকা ও রোগের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানা যাবে;
- সার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের রোগ ও পোকার আক্রমণ কমানো সম্ভব তা জানা যাবে;
- পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের রোগ ও পোকার তীব্রতা কমানো সম্বন্ধে জানা।

সময়: ৬০ মিনিট

উপকরণ: মার্কার পেন, ম্যানিলা পেপার, পোকা ও সারের নমুনা।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

পাঠ শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ জানতে পারবেন-

- কুশলাদি বিনিময়ের পরে কেন এ সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সার ও পানি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা প্রদান;
- ম্যানিলা পেপারে পোকার নাম লিখা ও সারের নমুনা প্রদর্শনসহ পোকার সাথে সম্পর্ক জানিয়ে দেয়া;
- ম্যানিলা পেপারে রোগের নাম লিখা ও সারের নমুনা প্রদর্শনসহ রোগের সাথে সম্পর্ক জানিয়ে দেয়া;
- প্রশ্ন করে সেশনের ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সার সংক্ষেপ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করা।

সেশন সহায়ক প্রশ্নাবলী

- কোন কোন সারে পোকার আক্রমণ বাড়ে?
- জৈব সারের সাথে ফসলের রোগের সম্পর্ক আছে কি?
- কোন কোন সারে রোগের আক্রমণ বাড়ে?
- পানি সরিয়ে ফসলের রোগ দমন সম্ভব কি?

১.১৭ সেশন সহায়ক নোট

সার ও পানির মাধ্যমে বালাই ব্যবস্থাপনা

গাছের খাদ্যোপাদানের সম্ভাব্য রাসায়নিক ও জৈব সারের সুব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের জন্য মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করাসহ গাছের জন্য খাদ্যোপাদান সরবরাহ অনুকূল মাত্রায় রাখা প্রয়োজন। গাছের কোষ বিভাজন ও বর্ধন, মাটি হতে খাদ্য রস গ্রহণ, গাছকে ঠাণ্ডা রাখা, খাদ্য ও অক্সিজেন তৈরি প্রভৃতির জন্য গাছের পানির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এছাড়াও ফসলের পোকা-মাকড় ও রোগ বালাইয়ের ওপর পানির প্রভাব রয়েছে। পানির প্রভাবে মাটিতে বসবাসরত অনেক পোকার ডিম, কীড়া, পুত্তলীসহ পূর্ণবয়স্ক পোকা মারা যেতে পারে। পানি ফসলের অনেক রোগ ছড়াতে যেমন সাহায্য করে, আবার পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের অনেক রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

সার ও পানির মাধ্যমে পোকা ব্যবস্থাপনা

পোকার নাম	সার ব্যবস্থাপনা	পানি ব্যবস্থাপনা
ধানের পামরী পোকা	সুষম সার ব্যবহার, বেশি ইউরিয়া ব্যবহার কমানো বা বাদ দেয়া	-
ধানের পাতা মাছি	সুষম সার ব্যবহার, অধিক ইউরিয়া ব্যবহার কমানো বা বাদ দেয়া	পানি বের করে দেয়া
ধানের বাদামী গাছ ফড়িং	সুষম সার ব্যবহার, পরিমিত ইউরিয়া সার কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ	জমি থেকে পানি সরিয়ে ফেলা
ধানের শীষ কাটা লেদা পোকা	-	জমিতে সেচ দিয়ে জমি পানিতে ডুবিয়ে রাখা
ধানের চুংগী পোকা	সুষম সার ব্যবহার, পরিমিত ইউরিয়া কিস্তিতে প্রয়োগ	আক্রমণ দেখামাত্র জমি থেকে পানি সরিয়ে ফেলা ও সম্ভব হলে কয়েকদিন শুকনা রাখা
ধানের থ্রিপস, ছাতরা পোকা ও উড়চুঙ্গা	-	জমিতে সেচ দেয়া
ধানের নলি মাছি		দাঁড়ানো পানি সরিয়ে দেয়া
বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা	সুষম সার ব্যবহার, অধিক ইউরিয়া সার ব্যবহার কমানো বা বাদ দেয়া	

সার ও পানির মাধ্যমে ফসলের রোগ ব্যবস্থাপনা

রোগের নাম	সার ব্যবস্থাপনা	পানি ব্যবস্থাপনা
ধানের পাতা পোড়া রোগ	সুষম সার ব্যবহার, অধিক ইউরিয়া সার ব্যবহার বাদ দেয়া পটাশ সার ব্যবহার, সম্পূর্ণ ইউরিয়া সার ২-৩ বার উপরি প্রয়োগ করা	জমির পানি সরিয়ে দেয়া ৭-১০ দিন পর আবার পানি দিতে হবে
ধানের ব্লাস্ট	সুষম সার ব্যবহার	জমিতে পানি ধরে রাখতে হবে
ধানের খোল পঁচা	সুষম সার ব্যবহার	জমিতে পানি ধরে রাখতে হবে
ধানের বাদামী দাগ	সুষম সার ব্যবহার	পানি ধরে রাখতে হবে
ধানের খোল পোড়া	বেশি নাইট্রোজেন ব্যবহার বাদ দেয়া। রোগ দেখা দেয়ার মাত্র পটাশ সার প্রয়োগ করা	পানি শুকিয়ে পর্যায়ক্রমে সেচ দেয়া
ধানের কাণ্ড পঁচা	সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ	জমি শুকিয়ে দেয়া

পানির মাধ্যমে ফসলের আগাছা ব্যবস্থাপনা

আগাছার নাম	পানি ব্যবস্থাপনা
বথুয়া	পানি দেয়া

১.১৮ সেশন পরিকল্পনা

সেক্স ফেরোমন ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষতিকর পোকা ব্যবস্থাপনা

কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান বাধার মধ্যে একটি হচ্ছে বালাই, আর বালাইয়ের মধ্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর হল পোকা-মাকড়। কীটনাশক প্রয়োগে ক্ষতিকর ও উপকারী উভয় ধরনের পোকা ধ্বংস হয়। এলোপাতাড়ি কীটনাশক প্রয়োগের ফলে জমি ও ফসলের ক্ষেতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিসহ পরিবেশে বিরূপ প্রভাব পরে। এমনকি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনে কীটনাশকের পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। সেক্স ফেরোমন ফাঁদ (গন্ধ ফাঁদ) ব্যবহারের মাধ্যমে পোকা দমন একটি পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি, এতে কীটনাশকের ব্যবহার ছাড়াই পোকা দমন সম্ভব।

সেশনের উদ্দেশ্য

সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ জানতে পারবে-

- ফেরোমন ফাঁদ ও এর কার্যকারিতা;
- ফেরোমন ফাঁদের প্রকারভেদ;
- ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার।

সময়: ৬০ মিনিট

উপকরণ: প্লাস্টিকের পাত্র, সরু জিআই তার, ফেরোমন টিউব, পানি, সাবান, বাঁশের খুঁটি।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশলাদি বিনিময়ের মাধ্যমে শুরু করা;
- সেশনের বিষয় ফ্লিপচার্টের উপরে লিখা ও সেশন সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা প্রদান;
- পোকা, কীটনাশক সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা প্রদান;
- সেক্স ফেরোমন ফাঁদ তৈরির কৌশল হাতে কলমে দেখানো ও ফাঁদ স্থাপন;
- প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করে সেশনের ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা।

সেশন সহায়ক প্রশ্নাবলী

০১. সেক্স ফেরোমন ফাঁদ (গন্ধ ফাঁদ) ব্যবহার করে কিকি পোকা দমন করা যায়;
০২. একই ধরনের ফাঁদ ব্যবহার করে কি বিভিন্ন ফসলের পোকা দমন করা সম্ভব;
০৩. আপনি কি মনে করেন সেক্স ফেরোমন ফাঁদের মাধ্যমে পোকা দমন করে লাভবান হওয়া সম্ভব।

১.১৮ সেশন সহায়ক নোট

সেক্স ফেরোমন ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষতিকর পোকা ব্যবস্থাপনা

সেক্স ফেরোমন হচ্ছে এক ধরনের প্রাকৃতিক রাসায়নিক পদার্থ যা কোনো প্রজাতির স্ত্রী পোকা কর্তৃক একই প্রজাতির পুরুষ পোকাকে প্রজননে আকৃষ্ট করার জন্য প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন হয়। সেক্স ফেরোমন ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটি প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত যা মানুষ বা পরিবেশের কোনোরূপ ক্ষতিসাধন করছে না। অন্যান্য মথ জাতীয় পোকার মতো বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার সেক্স ফেরোমন দুটি যৌগিক পদার্থ সমন্বয়ে গঠিত। পোকা ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো ধরনের ফাঁদ ব্যবহার করা হবে তা সাধারণত পুরুষ মথের আচরণের ওপর নির্ভর করে। বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা ব্যবস্থাপনার জন্য কয়েক ধরনের ফাঁদ কার্যকর। যেমন-

- **ডেল্টা ফাঁদ:** ত্রিকোণাকৃতি বা ডেল্টা আকৃতির কার্ডবোর্ড টিউব দিয়ে তৈরি। কোণাকৃতি অংশে টোপ ঝুলানো থাকে এবং নিচের পৃষ্ঠাদেশ আঠা বা গ্লু দিয়ে আবৃত থাকে।